স্মৃতি-অর্ঘ্য

উপন্যাস বাংলা সাহিত্যে নূতন আমদানি। আমাদের কাব্য সাহিত্য বহুযুগের, তবু মধুসূদন "সনেট" বস্তুটি পশ্চিমী সাহিত্য থেকে আমাদের প্রথম উপহার দিয়েছিলেন, আজ তো বাংলা ভাষায় সনেটের ছড়াছড়ি। তেমনি কুমারী তরু দত্ত (১৮৫৬-১৮৭৭) যখন জন্মালেন তখন পদ্যে কথা ও কাহিনী হয়ত বহুল প্রচার ছিল, কিন্তু নভেল বা উপন্যাসের সুরুও হয়নি। ১৮৫৮তে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা ও বঙ্কিমচন্দ্র তার প্রথম গ্র্যাজুয়েট; মাইকেলের মতন তিনি ইংরেজীতে লিখে প্রসিদ্ধ লাভ করতে চেষ্টা করেন, Rajmohon's wife (Indian field—1864) নভেল তার প্রমাণ। তরু তার পিতা ও ভগ্নী অরুর সঙ্গে যখন বিলাতে পড়া-শুনা করতে শুরু করেছেন (১৮৬৯) তখনও বঙ্গদর্শন ছাপার দু'বছর দেরী। বঙ্কিমের হাত থেকে দুর্গেশনন্দিনী (১৮৬২-১৮৬৩) কপালকুণ্ডলা (১৮৬৬) মৃনালিনী (১৮৬৯) প্রভৃতি দু'চারখানি রচনা বেরিয়ে বাংলায় উপন্যাস সাহিত্যের সূচনা করেছে।

১৮৭০-১৮৭৩ তিন বছর মাত্র ফ্রান্সে ও বেশীর ভাগ সময় ইংলণ্ডে পড়া-শুনা করে যখন তিনি কলিকাতায় ফিরলেন তখন বঙ্গদর্শনের ও উপন্যাস সাহিত্যের আদি পর্ব। দুর্গেশনন্দিনীর উপর Scott তথা Ivanhoe'র প্রভাব নিয়ে হয়ত তখন তর্ক চলেছে। কাব্য জগতের

দিকপাল মধুসূদন তখন গতায়ু। যে নিষ্ঠুর যক্ষ্মা রোগে তরু ২১ বছরে এ-জগৎ ত্যাগ করলেন, সেই রোগেই ভগ্নী অরুর মৃত্যু হ'লো (২৩ জুলাই ১৮৭৪), যেন কালের ঘণ্টা শুনেই তরু তন্ময় হয়ে তাঁর যা কিছু বলবার, যা কিছু লিখবার সবই চকিতে শেষ করলেন। তার "ইংরেজী" কবিতাগুলির আদর তখন এতটা হ'য়েছে যে Edmond Gosse-এর মত বিচক্ষণ সমালোচক Examiner (Aug 1876) এ, তার উচ্ছ্বসিত প্রসংশা করলেন। তা ছাড়া Revue de deux mondes (Feb. 1877)-এর মত বিশ্ববিখ্যাত ফরাসী পত্রিকায়, André Theuriet ও সমালোচনা করলেন তাঁর "ফরাসী কাব্যে"র ইংরেজী অনুবাদগুলির তারিফ করে। তরুর অকাল মৃত্যুর পূর্বে হয়তো এই রকম দু-একটী ক্ষীণ প্রশংসা তিনি নিজে প'ড়ে গিয়েছেন। কিন্তু তার মণীষার সর্বশ্রেষ্ঠ নিদর্শনটি বাঙালীর কাছে প্রায় সম্পূর্ণ অপরিচিত রয়ে গেল—সেটী তরুর ফরাসী ভাষায় রচিত উপন্যাস Le Journal de Mlle. d'Arvers (কুমারী আরভার-এর দিন পঞ্জী)।

এই বইখানি বহু পরিশ্রমে ও একনিষ্ঠ সাধনায় বন্ধুবর শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায় মূল ফরাসী থেকে বাংলা ভাষার অনুবাদ করে আমাদের ধন্যবাদ অর্জন করেছেন। George Sand, Stendhal, Maupassant'র যুগে ১৮ বছর বয়েসের এক বাঙ্গালী মেয়ে ফরাসী ভাষায় নভেল লিখে যে সাহসের পরিচয় দিয়েছেন তা যেমন অসামান্য তাঁর মণীষাও তেমনি অপূর্ব। ভাষা বিদেশী হ'লেও ভাবের রাজ্যে তরু যে তাঁর বাঙ্গালী মানস-সম্পদ কি ভাবে পরিস্ফুট করেছেন সেটি সমজদার পাঠক পাঠিকারা বুঝতে পারবেন। Garoin de Tassy (১৮৬৯) Madame Saffray, James Darmesteter (১৮৭৮) দের

মতন প্রবীণ ফরাসী সাহিত্যিকরাও তরু দত্তের মণীষা ও কলা নৈপুণ্যের মুগ্ধ হ'য়ে ছিলেন।

বাংলা উপন্যাস-সাহিত্যের আদিপর্বে ১৯।২০ বছর বয়েসের বাঙ্গালী মেয়ের ফরাসী উপন্যাসখানি আজ বাঙ্গালীদের উপহার দিলেন বলে রাজকুমার বাবুকে সাদর অভিনন্দন জানাই, সেই সঙ্গে মনে করাতে চাই তরু দত্তের উপযুক্ত মর্যাদা আমরা এখনও দিতে পারিনি। স্বাধীন ভারতে এই ত্রুটী শীঘ্র সংশোধন করা হ'বে আশা রাখি।

শ্রীকালিদাস নাগ।

প্রসঙ্গত

বইখানি সম্বন্ধে বলবার মত কিছু নেই তবে যিনি বইখানি লিখেছেন তার কথা চিরকালই বাঙ্গালী মাত্রকেই স্মরণ করতে হ'বে, আপন ছেলে মেয়েদের বলতে হ'বে কারণ বিশ্ব-সাহিত্যে তরু দত্ত একটা অপূর্ব উদাহারণ। ইংরাজীতে ইংরাজ ব্যতীত পৃথিবীর অনেক জাতির সন্তানরা বই লিখেছেন কিন্তু পৃথিবীর মধ্যে ফরাসী ব্যতীত ফরাসী ভাষায় এত বড একখানি উপন্যাস লিখে গেছেন একমাত্র তরু দত্ত, এটা বাংলা দেশের বড কম গৌরবের বিষয় নয়, বাংলা সাহিত্যেরও এ বইখানি অমূল্য নিদর্শন হওয়া উচিত কারণ সূক্ষ্মভাবে বিচার করতে গেলে বলতে হয় এ-খানি ফরাসী ভাষায় লেখা বাংলা উপন্যাস। তরু দত্ত বইখানি লেখেন যখন তার বয়স মাত্র আঠার।

তরু দত্ত সম্বন্ধে আমার কিছুই জানা ছিল না। বইখানি আমার হাতে পড়ে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে পুস্তক তালিকা প্রস্তুত কারক হিসাবে কাজ করতে ঢুকে। তখনও পুস্তকখানি যে বাঙ্গালীর কত আদরের ধন তা বুঝতে পারিনি। একদিন আমারই প্রস্তুত করা ফরাসী পুস্তকের তালিকা দেখতে দেখতে পূজ্যপাদ ডাঃ কালিদাস নাগ পুস্তকখানির উপর আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং বইখানি আমায় অনুবাদ করতে বলেন। সঙ্গে সঙ্গে আমি অনুবাদ করি। আসল বইয়ের ভাষার সঙ্গে অনুবাদের ভাষার সামঞ্জস্য রাখা যতটা সম্ভব চেষ্টা করেছি এবং আসল বইয়ের একটী কথাও অনুবাদ করতে বাদ পড়েনি। তবে প্রুফ দেখার দোষে দু-এক জায়গায় একটু দোষ রয়ে গেছে সে জন্য পাঠক পাঠিকার কাছে আমি ক্ষমা প্রার্থনা করছি।

তরু দত্তের জন্ম কলিকাতায় ১২ নম্বর মানিকতলা ষ্ট্রিট, ৪ঠা মার্চ ১৮৫৬ সালে। তাঁর পিতার নাম গোবিন্দ চন্দ্র দত্ত। কর্ণওয়ালিশ

খ্রাইষ্ট চার্চে ১৮৬২ সালে তরুর পিতা খৃষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেন। ১৮৬৯ সালে গোবিন্দ দত্ত তার দুই কন্যা আর অরু তরুকে সঙ্গে নিয়ে প্রথম যা'ন নীসে। সেখানে একটী Pensionnat'তে তরু শিক্ষা আরম্ভ করেন।

১৮৭০ সালের সম্ভবত মে মাসে তারা ইংলণ্ডে এসে ব্রমটনে একটী বাড়ী ভাড়া করে বাস করতে থাকেন। তরুর কবিতা লেখা সুরু এইখান থেকেই। ১৮৭৩ সালে তারা দেশে ফিরে আসেন। ১৮৭৪ সালের ২৩শে জুলাই অরু যক্ষ্মা রোগে মারা যান। সম্ভবত এই সময় উপন্যাসখানি তরু লিখতে সুরু করেন। তরুও যক্ষ্মাক্রান্ত হ'ন এবং ২১ বছর বয়েসে ১৮৭৭ সালে ২০শে আগষ্ট তারিখে মারা যান এইটুকু বয়েসে কবি ও উপন্যাসিক হিসাবে তিনি ফ্রান্স ও ইংলণ্ডে যথেষ্ট নাম করেছিলেন।

বইখানি আমি অনুবাদ করেছি বটে কিন্তু আসল বইখানি ভাষান্তর হওয়ার জন্যে মুখ্যত দায়ী পূজনীয় ডাঃ কালিদাস নাগ সেজন্য প্রশংসা যদি কিছু পাবার থাকে তা তাঁরই প্রাপ্য।

বাংলা দেশে আর কোথাও আসল বইখানির কপি আছে কিনা আমার জানা নেই—তবে থাকার সম্ভবনা খুব কম।

বইখানি ১৮৭৯ সালে Libraire Academique, Didier et Cie, Libraire Editeurs, Paris, দ্বারা প্রকাশিত হয়। এবং তরু দত্তের পিতা গোবিন্দ চন্দ্র দত্তের দ্বারা বইখানি মহামান্য বড়লাট লর্ড লিটনের কর কমলে ১৮৭৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে অর্পিত হয়

চন্দননগর   শ্রীরাজকুমার মুখোপাধ্যায়
১৯৪৯

———

কুমারী আরভ্যার-এর দিনপঞ্জী

২০ এ আগস্ট ১৮৬০

আজ আমার জন্মদিন। আমার বয়েস এখন পনের, পাঁচ বছর পর হবে কুড়ি! সময় উড়ে চলেছে। মা ভীষণ ব্যস্ত। আমার জন্মোৎসব, তাই তিনি সব ব্যবস্থা করছেন। এত বছর আমি যে কুভাঁয় কাটালাম, সেই কুভাঁ, এবার আমায় ছেড়ে যেতে হলো। কাল আমি এখানে এসেছি। দিদিমণিরা সকলেই আমায় এক একটি উপহার দিয়েছেন। বাবার সঙ্গে চিরকালের জন্যে কুভাঁ ছেড়ে যেতে দেখে, দিদিমণিরা সকলেই আমার দিকে মনমরা হয়ে চেয়ে রইলেন, বিশেষ করে দিদি ভেরনিক। তিনি দেবতার বেদীর তলে আমায় সঙ্গে নিয়ে বহুক্ষণ প্রার্থনা করবার পর, আমায় আলিঙ্গন করে একটি রূপার ক্রোয়া দিয়ে বললেন, "এটি সঙ্গে থাকলে সৌভাগ্য তোমার সঙ্গে থাকবে" এই কথা বলতে বলতে তিনি ক্রোয়াটী একটী কালো সুতোয় বেঁধে আমার গলায় ঝুলিয়ে দিলেন। তিনি বললেন, "যখনি জীবন আমার বেদনায় আকুল হয়ে উঠেছে তখনই এই ক্রোয়াটী আমায় সান্ত্বনা দিয়েছে। তোমার প্রয়োজন হ'লে তোমাকেও এই ক্রোয়াটী সান্ত্বনা দেবে। যিনি এই ক্রোয়ার উপর বিদ্ধ হয়ে জীবন ত্যাগ করেছেন তাঁ'রই চিন্তা কোরো সব সময়। তোমার মন কত ভালো তা আমি জানি। ভগবানের উপর তোমার অগাধ বিশ্বাস। তোমার জীবনের দুর্দিনে তিনি তোমায় আশীর্বাদ করবেন"।

তাঁর কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমার অশ্রু ঝরে পড়লো; সত্যি! তিনি ছিলেন আমার বড় বোনের মত। বাবা আমার

জন্যে বসবার ঘরে অপেক্ষা করছিলেন। আমরা দুজনে ছেড়ে চললাম এই শান্তির নীড়। স্নেহময় পিতার দেখা পেয়ে মন আমার আনন্দে পরিপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বাড়ী পৌছাবার পূর্বেই তাঁকে বহুবার আলিঙ্গন করলাম। আমায় কাছে পেয়ে আনন্দে তাঁর মুখে হাসি ফুটে উঠলো। তিনি বললেন:

—আরে! তুই তো খুব সুন্দরী হয়ে উঠেছিস দেখছি। তোর মা তোকে চিনতেই পারবে না।

—আমাকে তুমি খুব সুন্দরী দেখছো, নয় বাবা?

—একেবারে অবাক হয়ে গেছি মা।

—তুমি আমায় বেশী বাড়িয়ে তুলছ বাবা। গাল দুটো একটু বেশী গোলাপী, মাদমোয়াজেল লেমঁয়েন্ সে কথা আমায় বলেছেন। আমি একটু কটা আর তার রং সোনার মত।

—একেবারে পাকা ধানের মত—

—ওঃ তুমি মুসের কথা বলছ বুঝি বাবা?

—কি! তোদের কুভাঁয় মুসের বই পড়তে দেয় নাকি?

—না, মাদমোয়াজেল ফার্ত একটা কবিতার বই আমায় পড়তে দিয়েছেন, সেই বইয়ে পেয়েছি ও কথাটা।

—সোনার মত রং যার সে মেয়েটী কে?

—মাদমোয়াজেল লেময়েন, মেয়েটী সত্যি সুন্দরী, বাবা! ধব্‌ধবে সাদা গায়ের রং আর একমাথা সোনার মতো চুল। কিন্তু বাবা, আমি বেশী পছন্দ করি দিদিমনি ভেরনিক্‌কে। তার সব কথা আমি তোমায় বলবো। আমার মনে হয় তিনি মাদমোয়াজেল লেময়েনের চে' ছোট, কিন্তু দেখলে মনে হয় তার বয়েস হয়েছে। তিনি যে কী ভালো মানুষ তা তোমায় কি বলবো বাবা, জানো বাবা!

আমার ছেলেমানুষী দেখে মাদ্‌মোয়াজেল লেময়েন হাস্‌তেন, কিন্তু দিদিমনি ভেরনিক আমায় সব সময় সাহায্য করতেন আর কোন জিনিষটা কেমন করে করতে হয় তা তিনি আমায় শিখিয়ে দিতেন। প্রথম প্রথম তোমার জন্যে আমার মন কেমন করতো। আমি কাঁদতাম আর আমার ছোট ঘর খানিতে বসে ভগবানকে ডাকতাম। আমার অবস্থা দেখে ভেরনিক দিদিমণি আমায় কত আদর করতেন। তাঁর মা বাবা কেউ নেই, একটী ছোট ভাই তাঁর অকালে মারা গেছে। সেই ভাইটীর কথাই তিনি আমায় সব সময় বলতেন। আর বলতেন একজন কাপিতাঁানের কথা, তিনি তাঁর ভাগ্‌নে, জাহাজ ডুবি হয়ে মারা গেছেন। তারপর তিনি আরম্ভ করতেন তাঁর নিজের জীবনের ইতিহাস।

এই সব নানা কথা আমি আমার বাবার সঙ্গে কইছিলাম।

পরের দিন সকালে আমরা বাড়ী পৌছালাম। স্নেহময়ী মা আমাদের জন্যে দরজায় অপেক্ষা করছিলেন। আমি ঝাঁপিয়ে পড়লাম তাঁর বুকে।

—মা!

—খুকী!

এতদিন বিচ্ছেদের পর আমায় কাছে পেয়ে মা বাবার আর আনন্দের সীমা নেই। রান্না ঘরে মার সঙ্গে আমায দেখে বাবা আমায় বললেন কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে নিতে।

—তোর জন্যেই তো উৎসব, বাবা বললেন।

কয়েকটি ভালো ভালো খাবার তৈরি করতে রান্না ঘরে আমি মা'র সঙ্গে ব্যস্ত। কাছাকাছি ভালো রাঁধুনী পাওয়া বড় মুস্কিল। আজ বিকেলে কত লোক আসবে আমাদের বাড়ীতে। কঁন্তেস

দে প্লুয়ার্‌ভ্যাঁ আসছেন তাঁর দুটী ছেলেকে সঙ্গে নিয়ে। বড় ছেলেই এখন কঁন্ত, অল্প বয়স। থেরেস্‌ কাল বিকেলে বলছিল "তাকে দেখতে রাজপুত্তুরের মত"। ছোটবেলায় তিনি ছিলেন আমার খেলার সাথী। কুভাঁয় যাওয়ার পর থেকে আর তার সঙ্গে আমার দেখা হয় নি; প্রায় চার বছর হয়ে গেলা। ছোট ছেলেরা পরস্পরকে শীঘ্রই ভুলে যায়!

প্রায় বিকেল ছ'টা, মা গেলেন কাপড় ছাড়তে। সাতটার সময় ভোজ আরম্ভ। এলো চুলে আমি একটী চেয়ারের উপর বসে ছিলাম। আমায় সে অবস্থায় দেখে মা আমার চুলের ভিতর হাত বুলোতে বুলোতে বললেন "কি করছিস মা! সময় নষ্ট করিস নে। সত্যি মারগো, তোর এই চুলের গোছাকে গুছিয়ে নিতেই অন্ততঃ দুটী ঘণ্টা সময় লাগবে।

এই কথা বলে তিনি তার হাতে করে আমার চুলের গোছা তুলে ধরলেন। মেয়ের এত চুল!—মায়ের বুক গর্বে ভরে উঠলো। তিনি আমার কপালে চুম্বন করলেন।

—ভালো করে সেজে নে, মাথায় নীল ফিতে বেঁধে নিস। তোর বাবা ভালোবাসেন তোকে নীল ফিতেয় দেখতে।

—আর সাদা মুসেলিনে, নয় মা ?

—হ্যাঁ।

আবার তিনি আমায় চুম্বন করলেন। সাড়ে ছ'টা বাজলো, আর নয়।

২২ এ আগস্ট

কাল বিকালটা কি আনন্দেই না আমার কেটেছে। সকলের

মুখেই আমার প্রশংসা। সকলেই আমার স্বাস্থ্য পান করলেন শাঁম্‌পাঁই'এ চুমুক দিয়ে।

যখন আমি সদর ঘরে প্রবেশ করলাম তখন দেখলাম মাদাম গোসেরেল ও তার মেয়ে এরই মধ্যে এসে গেছেন। তাঁরা আমার মার সঙ্গে কথা কইছিলেন। বাবা আমার কানে কানে বললেন "তোকে দেখতে হয়েছে ঠিক একটা মারগেরীৎ ফুলের মত সুন্দর। আমায় দেখতে পেয়ে মাদমোয়াজেল গোসেরেল আদর করে আমার একখানি হাত তার হাতের মধ্যে নিয়ে বললেন—এই দেখ মা, কত বড়টা হয়ে উঠেছে।

মাদমোয়াজেল ইউফোনী গোসেরেল সে দেশের সুন্দরী মেয়ে। তার বয়েস আমার চে' বেশী, মনে হয় চাব্বিশ। দেখতে শুনতে বড়ো সড়ো, লাল সোনার মত চুল, যেন মাথার চারদিক আলো করে রয়েছে। বর্ণহীন দুটী চোখ জ্বল্ জ্বল্ করে জ্বল্‌ছে। নাকটা সুন্দর ও লম্বা, প্রশস্ত কপাল, ঠোঁট দুটী একটু যেন বেশী পাতলা, সাদা দাঁতগুলি সরল ভাবে সাজানো। মুখে হাসি লেগেই আছে। বাবা বলেন—সে হাসে, কেবল তার সুন্দর সাদা দাঁতগুলি সকলকে দেখাবার জন্যে। হাসবার ইচ্ছে না হলে কেউ কি কখনও হাসতে পারে! বাবার যেমন কথা। তিনি সব সময় আমায় নিয়ে ফষ্টি নষ্টি করেন। মাদমোয়াজেল গোসরেলের সঙ্গে কথা কইছিলাম, এমন সময় ঘরের দরজা খুলে গেলা। আমাদের জানানো হল কঁন্তেস দে প্লুয়ারভ্যাঁ ও তাঁর ছোট ছেলে গাস্তঁ এসেছেন। মা এগিয়ে গেলেন কঁন্তেসকে সম্বর্ধনা করতে। তাঁকে চাঁদোয়ার নীচে বসান হলো।

—মারগেরীৎ! সে কোথা?—কঁন্তেস মাকে জিজ্ঞেস করলেন। মা আমায় ইশারা করলেন কঁন্তেসের কাছে যাবার জন্যে। আমি

এগিয়ে গেলাম। মাদাম কঁন্তেস আমার কপালে চুম্বন করে বললেন

—তোর মনে আছে? দুনোয়া আর গাস্ত'র সঙ্গে খেলা করবার জন্যে তুই প্রায় প্রাসাদে যেতিস্। তোকে আমি আমার নিজের মেয়ের মত দেখতাম। এখন কি তুই আর দুনোয়াকে চিনতে পারবি? মনে হয় না।

চিনতে না ও পারতে পারি, তখন আমি বড় ছোট ছিলাম।

—এখন কি হয়েছিস শুনি? তিনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন। বয়েস তো তোর এই সবে ষোল। দুনোয়ার বয়েস হলো তেইশ।

আবার ঘরের দরজা খুলে গেল। কঁন্তেস গর্বভরে বলে উঠলেন:

—ঐ, ঐ সে আসছে। কী সুন্দর দেখতে বলতো?

—হ্যাঁ।

কথাটা আমার মুখ থেকে বেরিয়ে গেল অনিচ্ছা সত্বে। লম্বা চেহারা, কেউ কেউ হয়তো বলবে একটু রোগা। কুঞ্চিত কালো কেশ, ঘাড়ের উপর ঝুলে পড়েছে। বড় বড় গভীর দুটী চোখ, সুন্দর কপাল। উপরের ঠোঁটটী কালো গোঁফে ঢাকা। চিবুক দেখলে মনে হয় লোকটী একটু গম্ভীর। মেয়েদের মত ধব্‌ধবে সাদা গায়ের রং। তাঁর মা তাকে ইশারায় কাছে আসতে বললেন।

—এই দেখ দুনোয়া, এ হলো মারগেরীৎ। বেশ বড় হয়ে উঠেছে, নয়?

তিনি আমায় নমস্কার করলেন। কঁন্তেস তাকে নিজের পাশে বসালেন।

—আরে! তোরা হাতে হাত দে। আগে তো তোরা দুজনকে দুজনে কত চুমু খেয়েছিস—তখন তো লজ্জা হতো না।

আমি লজ্জায় লাল হয়ে উঠলাম। কঁস্তেস আমার একখানি হাত তাঁর হাতের উপর রাখলেন। দুনোয়া হাসতে হাসতে বললেন

—মা'র একটুও লজ্জা নেই। মাদমোয়াজেল গোসেরেল যে আমাদের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

—বেশ তো—তাতে হয়েছে কি? এমন কিছু অন্যায় কাজ করছি না কি?—কঁস্তেস হাসতে হাসতে বললেন।

আমি হাত সরিয়ে নিতে তিনি আনন্দে হেসে উঠলেন। তিনি আমার কপালে একটী চুম্বন দিয়ে আমার চুলের ভিতর হাত বুলোতে বুলোতে তার পুত্রের দিকে চেয়ে বললেন

—সুন্দরী, নয়? কি বল?

—হ্যাঁ মা, সুন্দরী বইকি, তিনি হাসতে হাসতে বললেন, কিন্তু তোমার চে' সুন্দরী নয়।

২২এ আগস্ট

আজ সকালে বাবা আর আমি বনের ভিতর বেড়াতে গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের দেখা হ'লো কঁস্ত ও তার ভায়ের সঙ্গে। আমি বুনো তুঁত ফল খেতে খেতে চলেছিলাম। তুঁত ফলের রঙে আমার ঠোঁট দুটী লাল হয়ে উঠেছিল। হঠাৎ আমাদের কানে এলো ঘোড়ার খুরের শব্দ। কঁস্ত ও তার ভাই আমাদের সামনে এসে হাজির হ'লেন। আমার তো ছুটে পালিয়ে যাবার ইচ্ছে হ'চ্ছিল। এলো চুল, ঠোঁট দু'টী তুতের রংএ একেবারে বেগুনী হ'য়ে গেছে, এ অবস্থায় কি লোকের সামনে বার হওয়া যায়। বাবা আমার হাত চেপে ধরলেন; চোখ দুটী তার দুষ্টুমিতে জ্বল্ জ্বল্ করছে। বাবা বললেন:

—এই দেখ দুনোয়া—একটী বুনো মেয়ে।

—তার চে’ বলুন জেনেরাল, বনদেবী, এই কথা বলে তিনি মধুর হাসলেন।

আমার ভারী লজ্জা হ’লো; সে অবস্থায় তিনি কি আমায় সুন্দরী দেখলেন নাকি! প্রায় দুপুর পর্য্যন্ত আমরা নানা কথা কইলাম। কঁস্ত আমায় জিজ্ঞেস করলেন, কবে আমি তাদের বাড়ী যাবো। আমার বাবা উত্তর দিলেন:

—পনের দিনের আগেতো নয়। বুঝতেই তো পারছ দুনোয়া, বহু দিন পর ওকে আমরা কাছে পেয়েছি; আমি তো ওকে এক মুহূর্ত চোখের আড় করতে পারিনা। যদি তোমার মা ওকে তাঁর কাছে নিয়ে যেতে চান তা হলে ও দু তিন সপ্তাহের মধ্যে তোমাদের ওখানে যাবে।

এ কথায় কঁস্ত যেন আনন্দিত হলেন বলে মনে হ’লো। তিনি বললেন যে তার মা আমায় সাদরে অভ্যর্থনা করবার জন্যে সব সময় প্রস্তুত হয়ে থাকবেন।

২৩ এ আগস্ট

আজ সকালে আমি গ্রামের যত বুড়ো বুড়ীদের সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। একটী সংসার আমার বড় ভালো লাগতো। সে সংসারে তিনটী প্রাণী,—বুড়ো বাপ আঁদ্রে কোর‍্যান, তার স্ত্রী মিশেল ও একটী ছোট্ট, শান্ত অথচ চটপটে মেয়ে, বয়স ষোলো। হতভাগ্য সংসার! দারিদ্র্যে ভরা তাদের জীবন। দৈনন্দিন রুটী রোজগার করবার জন্যে মেয়েটী যথাসাধ্য চেষ্টা করে। কিন্তু সে যা আনতো তা’তে সকলের কুলিয়ে উঠতো না। তাদের দৈন্যের কথা কখনও তারা কারো কাছে প্রকাশ করতো না এবং সে জন্যে তারা দুঃখিতও

ছিলনা। কিন্তু এত চাপাচুপি দেওয়া সত্ত্বেও তাদের যে ভীষণ অভাব তা আমি বেশ বুঝতে পারতাম। আমি তাদের কথা কঁস্তেসকে বলবো।

২৪ এ আগস্ট

আজ সকালে আমি আমার জানলার কাছে বসে আছি। আবহাওয়াটা ভারী সুন্দর। নির্মল আকাশ, মেঘের লেশ মাত্র নেই। আমি ভাবছিলাম মঙ্গলময়ের আমাদের উপর কত করুণা! আমরা তো পাপীর দল! একটা চড়াই পাখীর উপর চোখ পড়লো, ঝর্ণার জলে তৃষ্ণা নিবারণ করছে—যতবার জল খায় ততবার সে আকাশের দিকে মাথা তোলে, যেন সে প্রতিবার সৃষ্টিকর্তাকে ধন্যবাদ দিতে চায়।

আজ বুড়ী গ্রেস্তিনের সঙ্গে দেখা করেছি। তার চে, বুড়া এ গাঁয়ে আর কেউ নেই। তারপর গেলাম কোরাঁদের বাড়ী। দেখলাম জানেৎ ঝোল রাঁধছে। আমি ঝোলের ভিতর খানিকটা মাখন আর একটা ফুলকপি ফেলে দিলাম। হাতের ঝুড়িটা থেকে প্রায় এক ডজন আলু নিয়ে ফেলে দিলাম উনানের আংরায় পোড়বার জন্যে। তার মা আর বাবা আমার কাজ দেখে আমায় নিরস্ত করবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু আমি তাদের বলেই রেখে ছিলাম, আমার কাজে তাঁরা যেন বাধা না দেন। জানেৎ বেড়ার ধার পর্য্যন্ত এগিয়ে এলো, ইচ্ছেটা আমায় ধন্যবাদ দেয়। আমি একটী চুম্বন দিয়ে তার মুখ বন্ধ করে দিলাম। তার চোখ দুটো অশ্রুতে ভরে উঠেছিল। আমি অনেক চেষ্টা করেও চোখের জল রোধ করতে পারলাম না।

আমি বাড়ী ফিরলাম একটা গেঁয়ো সুর গাইতে গাইতে। বাবার গলা কানে এলো, তিনি আমায় ডাকছেন।

—যা হোক ফিরেছিস শেষ পর্য্যন্ত, এই কথা বলতে বলতে তিনি সদর ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন।

—ভাবছিলাম, তোর হোলো কি!

—বাবা, তুমি কি আমায় খুঁজছিলে?

—ভেতরে আয়। এই দেখ্ লুই এসেছে, প্রায় একঘণ্টা হোলো, আমি ছাড়া তার সঙ্গে কথা কইবার বাড়ীতে আর কেউ নেই।

আমি লুইকে কখনও দেখিনি। বাবা তার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দিলেন।

—লুই, এই আমার মেয়ে—আমার একমাত্র কন্যা।

প্রাণখোলা হাসি হেসে লুই আমার দিকে তার একখানি হাত বাড়িয়ে দিয়ে এমন বন্ধুভাবে আমার দিকে চাইলেন যে আমার আড়ষ্ট ভাব একেবারে কেটে গেল।

—আরে! তোর মনে নেই লুইকে!—বাবা আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

আমি মাথা নেড়ে জানালাম,—না।

—ওঃ! দুজনেই তখন তোরা ছোট ছিলি।

লুইয়ের বয়েস এখন মাত্র ২০। গায়ের রং রোদ পোড়া, সুন্দর চেহারা, সুদৃঢ় বক্ষ, ঘন কটা চুল,—এই হলো দু'কথায় তার চেহারার বর্ণনা। চোখ দুটীর রং বাদামী,—অচঞ্চল, গম্ভীর, নম্র ও সরল। ঠোঁট দুটীতে মাঝে মাঝে যেন বিষাদের ভাব ফুটে ওঠে, বিশেষ করে, যখন সে তার মার কথা কয়। কিন্তু যখন সে হাসে তখন তার সারা মুখ উজ্জ্বল হ'য়ে ওঠে। বাবা আমার কাঁধের উপর হাত রেখে বললেন।

—সাবধান! তোর সামনে ২০ নং হালকা ঘোড়সওয়ারের অধিনায়ক লুই লেফ্যাব্র, সগু আলজেরী থেকে ফিরছেন। কয়েকদিন এখানে থাকবেন। একখানা ঘর তার জন্যে ঠিক করে দে। আগে ছুটে গিয়ে মা'কে খবরটা দিয়ে আয় যে লুই এসেছে। আমি তাকে খুঁজে পেলাম না, খুঁজে পেলে আমিই তাকে খবরটা দিতাম।

মা'র দেখা পেলাম সব্জি বাগানে, সীম গাছে জল দিচ্ছিলেন।

—মা, লুই লেফ্যাব্র এসেছেন।

তিনি হঠাৎ মুখ ফিরিয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

—কি বললি? এ সুখবর দেওয়ার জন্যে তোকে একটী চুমো দেবো।

আমায় চুম্বন করে' মা আমার হাত ধরে এগিয়ে চললেন বাড়ীর দিকে।

—আঁরী, কেন তুমি আমায় খবর দাওনি?

বাবা একটা নতুন বন্দুক লুইকে দেখাতে দেখাতে মুখ তুলে বললেন।

—তোমায় তো কোথাও খুজে পেলাম না।

—বাবা লুই, তোমায় দেখে আমার ভারী আনন্দ হ'চ্ছে

মা কাপিতঁ্যানের দিকে এগিয়ে গিয়ে তার কপালে চুম্বন করলেন। লুই আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে গেলেন। তার ঠোঁট দুটী কাঁপতে লাগলো। চোখ দুটীতে অশ্রু টলমল করছে। বাবা তাঁর কাছে আমায় টেনে নিলেন। দেখলাম তাঁর চোখেও জল। আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।...আজ আমি সব বুঝতে পেরেছি!

১৭ বছর বয়সে লুই তার বাবা মাকে হারায়। পিতার মৃত্যুর দুদিন পর তার মা মারা যায়। লুইয়ের ও আমার পিতা একই রেজিমেঁ‌টায় কাজ করতেন। দুঃখে পাগল হয়ে লুই আফ্রিকায় চলে যায়। বাবার সঙ্গে সেই তার শেষ দেখা।

—লুই, তোমার শরীর বেশ ভালো ছিল তো? মা জিজ্ঞেস করলেন।

—না, সব সময় নয়। এখান থেকে যাবার তিন দিন পরে আমার জ্বর হয়েছিল। প্রায় এক মাস ভুগেছিলাম। তারপর তিনি হাসতে হাসতে বললেন, এখন বেশ ভালোই আছি। আমার তুল্য স্বাস্থ্যবান হয়তো আর কেউ নেই।

খাওয়া দাওয়ার পর লুইকে আমার হাতে ছেড়ে দিয়ে বাবা বললেন

—মারগেরীৎ, এখন তুই লুইকে যত্ন কর, আমি চললাম চিঠি লিখতে। তোর মা ঘর দুখানা গোজগাছ করতে লেগে গেছে।

আমাদের অতিথিকে নিয়ে আমি বাগানে গেলাম। আমার খরগোসগুলি তাকে দেখালাম। একটা খরগোসকে তুলে নিয়ে তিনি তার গায়ে হাত বুলোতে লাগলেন। পাজী খরগোসটা দিলে তার হাতে কামড়ে। খরগোসটিকে তিনি ঘাসের উপর নামিয়ে দিলেন, যেন কিছুই হয়নি এমনি ভাব। কিন্তু তার আঙুলের উপর রক্তের ধারা।—আমি চিৎকার করে উঠলাম।

—জানোয়ারটা আপনাকে কামড়ে দিয়েছে বুঝি?

তিনি হাসলেন

—ও কিছু নয়।

কিন্তু আমি ছাড়লাম না। তখন তিনি বাধ্য হয়ে দেখালেন তাঁর আঙ্গুলের উপর চারটী দাঁতের দাগ। আমি তাঁর আঙ্গুল বেঁধে দিলাম।

—আমি বড় দুঃখিত! বললাম বিমূঢ়ের মত,—কিন্তু আপনার বেশী লাগেনি, নয়?

—একটুও না

তারপর তিনি মৃদুস্বরে বললেন:

—আপনাকে দেখে আমার মায়ের কথা মনে পড়ছে। আমি কোন উত্তর দিলাম না। তিনি আবার বললেন:

—আপনি কি আমার মাকে দেখেছেন?

—মনে হয় দেখেছিলাম, কিন্তু ঠিক স্মরণ হয় না।

একটা ওক গাছের ছায়ায় আমরা বসলাম। অমি জিজ্ঞেস করলাম:

—আফ্রিকায় কি আপনার খুব বেশী অসুখ করেছিল?

—বাঁচবার আশা ছিল না। সান্ত্বনা দেবার জন্যে প্রিয়জন তো আমার পাশে কেউ ছিল না। অসুখ হয়েছিল আমার মা মারা যাবার প্রায় এক মাস পর। একজন বন্ধু আমার সেবা করতো। স্বপ্নে বহুবার মাকে দেখেছিলাম, মর্মরের-মত-সাদা-মুখে মধুর হাসি। সারা মুখখানি আলোকদীপ্ত। তিনি যেন আমার হাত দুটী তার হাতের মধ্যে নিয়ে আমার কপালে চুম্বন করছেন। তারপর আমি জেগে উঠতাম সুস্থ হয়ে, কিন্তু বেদনায় যেন বুকের ভিতরটা মুচড়ে উঠতো। মায়ের কাছে পৌঁছাতে যে আমার এখনও অনেক দেরী!

তিনি চুপ করে লক্ষ্যহীন ভাবে মাঠের দিকে চেয়ে রইলেন। আমার দুই চোখে অশ্রু ঝরে পড়লো।

তিনি হঠাৎ আমার দিকে ফিরে চেয়ে বল্‌লেন

—আমার জন্যে আপনার চোখে জল এলো ?

—না জানি আপনি কত কষ্ট পেয়েছেন।

কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ থাকবার পর তিনি সংযত স্বরে বললেন।

—চলুন, আমায় আপনার বাবার বুড়ো ঘোঁড়াটা দেখাবেন।

২৫এ আগস্ট

আজ সকাল সকাল উঠে, খাবার আগেই, আমি হাঁস মুর্গি গুলোকে খেতে দিচ্ছিলাম। লুই এসে হাজির হ'লেন।

—আজ তো খুব ভোরে উঠেছেন! আমারও আজ সকাল সকাল ঘুম্ ভেঙ্গে গেছে।

—হ্যাঁ। আপনার আঙ্গুল কেমন ?

—খুব ভালো বলে তো মনে হয়, তবে আজ সকালে অবস্থাটা এখনও দেখিনি।

—বাঁধন খোলেন নি বুঝি এখনও! আমি অবাক হয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

—না, আপনি বেঁধেছেন, আপনিই খুলবেন।

তার ইচ্ছাই পূর্ণ করলাম। সেই সময় বুড়ী ধাইমা সেখানে এলো।

—কাপিতঁ্যানের কি হলোরে খুকী ?

—আমার খরগোসটা কামড়ে দিয়েছে

—ওঃ এ...ই। আমার তো মনে হয়েছিল উনি গুরুতর ভাবে আহত হয়েছেন।

এই কথা বলে সে চলে গেল। যাবার সময় সে একবার আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলে। চোখে তার দুষ্টুমির হাসি।

—ও আমার মাকে মানুষ করেছে। আচ্ছা আপনি কি কখনও আঘাত পেয়েছেন ?

—তিনবার।

—গুরুতর ভাবে ?

—গুরুতর আঘাতের কথাই বলছি।

প্রাতর্ভোজনের পর সকলে বনের ভিতর বেড়াতে গেলাম। মা ও বাবা আমাদের আগেই বাড়ী ফিরলেন। লুই আর আমি একটী নদীর ধারে বেড়াচ্ছিলাম। লুই বুনো পথের পানে চেয়ে বললেন

—কে যেন আসছে।

আমি মুখ ফেরালাম

—কঁস্ত। আমি উত্তর দিলাম

—কোন কঁস্ত ?

—কস্ত দে প্লুয়ারভ্যঁ।

—আপনি তাকে চেনেন ?

—হ্যঁ, আমি যে কুভাঁয় থাকতাম তাঁর মাও সেই কুভাঁয় থাকতেন।

কঁস্ত আমাদের কাছে এসে আমায় প্রণাম করলেন, তার পর লুইয়ের দিকে হাত বাড়িয়ে দিলেন।

—আমার আজ সৌভাগ্য যে কাপিতাঁ্যান লেফ্যাভ্র'এর সঙ্গে কথা কইবার সুযোগ পেলাম। আপনি যে রেজিমাঁয় কাজ করেন, আমার বাবাও সেই রেজিমাঁয় কাজ করতেন।

লুই হাসলেন।

—সত্যি ?

আমরা কথা আরম্ভ করলাম। কঁস্ত বললেন

—আপনার আশা করে আমার মা বসে আছেন। আমাদের প্রাসাদে আপনার দেখা পাবার সৌভাগ্য কবে হবে আমাদের!

—সম্ভবতঃ দিন পনের পরে।

—আমার মামাও প্রায় সেই সময়ে আসবেন। যা'ক ভালোই হবে—তা না হলে আপনি হয়তো আমাদের বাড়ীতে বিরক্ত হ'য়ে উঠতেন।

—না না, বিরক্ত আমি কিছুতেই হতাম না।

—আপনার কথায় আমি বিশ্বাস করতে পারি, কারণ মন যার ভালো সে সহজে বিরক্ত হয় না।

—সত্যি কথাই বলেছেন। লুই এই কথা বলে আনমনে নদীর জলে পাথর ছুড়ে ছুড়ে ফেলতে লাগলেন।

শীঘ্রই আমরা বাড়ী ফেরবার জন্যে উঠলাম। বিদায় নেবার সময় কঁস্ত লুইকে বললেন :

—আশা করি শীঘ্রই আবার আপনার সঙ্গে দেখা হবে। আপনার সঙ্গে পরিচয় হলে আমার মামা খুব আনন্দিত হবেন

—ধন্যবাদ। লুই উৎফুল্ল হ'য়ে বলে উঠলেন। কঁস্ত চলে গেলেন।

২৯ এ আগস্ট

আজ সকালে লুই চলে গেলেন। তিনি চলে যাওয়ায় আমরা সকলেই মনমরা হ'য়ে পড়লাম। মা তাঁকে বিদায় দেবার সময় কেঁদে ফেললেন; তাঁর কাছে থেকে কথা নিয়ে নিলেন যেন শীঘ্রই তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন। বাবা আর আমি তাঁর সঙ্গে কিছু দূর এগিয়ে গেলাম। সকলেই আমরা চুপ করে ছিলাম; যদিও বিদায়ের উত্তরে পাওয়া যায় "আবার দেখা হবে", তা হ'লেও বিদায় দেওয়া যেন সব সময় কষ্টকর। গির্জার কাছে এসে তিনি

আমাদের কাছ থেকে বিদায় নিলেন। আমার একখানি হাত তাঁর হাতের মধ্যে চেপে ধরে লুই বললেন

—আমায় ভুলে যাবেন না।

—না না, আপনি বিশ্বাস করুন আমার কথা।

—আর আমি, আমি আপনাকে কখন ভুলতে পারবো না। আপনার সঙ্গে যদি আমার আর দেখাও না হয় তা হলেও আমি আপনাকে ভুলতে পারবনা।

—কিন্তু আমাদের দেখা তো আবার হবে। আপনি তো আবার আসছেন।

—আপনাব কি আনন্দ হ'বে আবার আমার সঙ্গে দেখা হলে ?

—নিশ্চয়। ওঁর সঙ্গে আমাদের আবার দেখা হলে খুব আনন্দ হবে, নয় বাবা ?

—নিশ্চয়! বাবা লুইয়ের দিকে চেয়ে বল্‌লেন।

লুই ঘোড়ায় চড়ে ঘোড়া ছোটালেন। বনের অন্তরালে অদৃশ্য হবার আগে, আমাদের দিকে ফিরে লুই তাঁর টুপি আন্দোলন করলেন। বাবা দুহাতের মধ্যে আমার মুখখানি ধরে অনেকক্ষণ আমার মুখের পানে চেয়ে রইলেন। আমাব স্নেহময় পিতা, কতই না তিনি আমায় ভালোবাসেন! তাব চোখ দুটী জলে ভরে উঠেছে।

—আমার নির্মল মাঠের ফুল, এই কথা বলে তিনি আমার কপালে চুম্বন করলেন।

আমরা বাড়ীর দিকে ফিরলাম। তিনি বললেন।

—দুঃখ করবার কিছু নেই। লুই আবার ফিরে আসবে বলে মনে হয়

—আমারও তাই মনে হয় বাবা। আমারও ইচ্ছে ছিল তিনি আর কিছু দিন থাকেন। তিনি যেন আমাদের মধ্যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি করে চলে গেলেন।

—তার চলে যাওয়ায় তোর মায়ের বড় কষ্ট হ'য়েছে। ছেলেটাকে তোর মা বড় বেশী ভালোবাসে, আমারও ছেলেটাকে বড় ভালো লাগে। আর তোর, মার্গো ?

—আমারও বাবা।

লুই নেই বলে বাড়ীটা যেন অন্ধকার। যদিও তিনি মাত্র কয়েক দিনের জন্যে এসেছিলেন তা হ'লেও এই ক'দিনে তিনি যেন আমাদের সংসারের একজন হয়ে গেসলেন। আজ বিকালে কঁন্তেস এসেছিলেন, মাকে আর বাবাকে আমার সঙ্গে তাঁর বাড়ীতে যাবার জন্যে বলতে; কিন্তু মা আর বাবা বললেন, যাওয়া তাদের সম্ভব হবে না। আমার ইচ্ছে ছিল তাঁরা কঁন্তেসের নিমন্ত্রণ স্বীকার করেন। তার পর কঁন্তেস বললেন যে তাঁর একজন পরিচারিকার দরকার। আমি তাঁকে জানেৎ কোরীয়ানের কথা বললাম। তিনি জানেতের সঙ্গে দেখা করতে চাইলেন। আমি বললাম জানেৎকে খবর দেব, তাকে প্রাসাদে যেতে বলবো। তাদের দৈন্যের কথা সব যখন কঁন্তেসকে বললাম তখন তাঁর চোখ দুটী ছল্ ছল্ করে উঠলো। আমার খুব আশা ছিল যে তিনি জানেৎকে পরিচারিকার কাজে নিযুক্ত করবেন।

কঁন্তেস আশ্চর্য্য হ'য়ে বললেন :

—তুই তো মাত্র একমাস হ'লো এখানে এসেছিস। এরই মধ্যে কবে গাঁয়ের দীন দরিদ্রদের খবর নিলি ? তাদের দেখবার জন্যেই যেন তুই আছিস মনে হয়।

৪ঠা সেপ্টেম্বর

আজ সকালে বাবা লুইয়ের একখানি চিঠি পেলেন। তিনি এখন পারীতে, শীঘ্রই আলজেরীতে রওনা হবেন। তিনি লিখেছেন "ডিসেম্বর মাসে যাবো, তখন আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে। আপনি ও মাদাম দা'রভ্যার আমার মা'কে যে যত্ন করেছেন তা আমি জীবনে ভুলতে পারবোনা। আমার দুঃখের দিনে যে সহানুভূতি আপনারা আমায় দেখিয়েছিলেন তার মূল্য আমি জীবনেও দিতে পারব না। ভগবান তার মূল্য দেবেন। আপনার এবং আপনার সংসারের সকলের স্বাস্থ্য ভালো রাখুন, ভগবানের কাছে এই আমার প্রর্থনা। এই ভ্রাম্যমানকে ভুলবেন না।—সে কথা আপনাকে বলা আমার শোভা পায় না কারণ আপনি আমায় স্নেহ করেন পিতার মত ও মাদাম তার নিজের ছেলের মত আমায় দেখেন এবং আমি জানি আপনাদের অন্তঃকরণের একটী কোণ আমার জন্যে সব সময়েই খালি থাকবে।

লুই লেফ্যাব্র।

আজ আমি কাঁস্তেসকে নিয়ে গেসলাম জানেতের সঙ্গে দেখা করতে। পাস্তঁ আমাদের সঙ্গে গেসলেন। মেয়েটির সঙ্গে কথা কয়ে কঁস্তেস খুব খুসী। তিনি তাকে নিযুক্ত করেছেন। জানেৎও খুব আনন্দিত। আমার হস্ত চুম্বন করতে করতে সে অশ্রুবর্ষণ করতে লাগলো। তার চোখে জল দেখে আমার চোখেও জল এলো। আমি তাকে শান্ত হ'তে বললাম। কোর‍্যানের মা ও বাবা আমায় শত মুখে আশীর্বাদ করতে লাগলেন। জানেৎ কাল প্রাসাদে যাবে। ফেরবার সময় কঁস্ত বললেন :

—আপনি সাত্যিই বড ভালো।

—না না, তবে ভালো হ'বার চেষ্টা করি। কিন্তু ভালো আমি মোটেই নই।

—কিন্তু আপনি না থাকলে এই দরিদ্র সংসারটার কি হ'তো বলুন তো ?

—ভগবান ওদের দেখতেন। তিনি তাঁর সৃষ্টিকে ভালোবাসেন তাঁর সৃষ্টির সব কিছুই তাঁর কাছে সন্তানের মত। পিতা কখনও পুত্রকে না দেখে থাকতে পারে ?

কিছুক্ষণ কারো মুখ দিয়ে কোন কথা বার হ'লোনা

—মেয়েটি খুব সুন্দরী, গাস্ত বললেন।

—শুনে আনন্দ হ'লো আপনার কথা। আপনার মতের সঙ্গে আমার মত মেলে দেখছি। ওর চোখ দুটি ভারী সুন্দর, নয় ? যেন শরৎ কালের আকাশের মত নীল।

—কথাটা কি আপনার প্রাণের কথা ?

—অর্থাৎ ? আমি জিজ্ঞেস করলাম চোখ তুলে। তার দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি মিলিত হ'লো। দেখলাম চোখ দুটি তার দুষ্টুমিতে ভরা।

—কি বলতে চাই তা জেনে আর লাভ কি বলুন।

এই কথার পর আমাদের ছাড়াছাড়ি হ'লো। আমরা আমাদের বাগানের কাছে এসে পড়েছিলাম।

৫ই সেপ্টেম্বর

কাল আমি প্রাসাদে যাবো। জিনিষ পত্র গুছিয়ে নিতে সারা সকালটা কেটে গেল। আটটা বাজলো। জানলা খুলে রেখেছিলাম; আকাশের উজ্জ্বল তারা গুলো যেন আমার পানে চেয়ে। চাঁদের রূপালী আলো ঘরের ভিতর আলো-ছায়ার সৃষ্টি করেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ

বাতাসের নিশ্বাসটুকুও শোনা যায় না। আমার চোখে যেন স্বপন লাগলো। মনে পড়লো দিদিমণি ভেরনিকের কথা। তিনিও ছিলেন ঐ পূর্ণিমার মত পান্‌সে ও পবিত্র। এখন তিনি পৃথিবীর কোলাহল থেকে দূরে, কুভঁার কবরখানায় শান্তিময় ও পবিত্র জীবন যাপন করছেন। কত করুণাময়ী ছিলেন তিনি, কত ভালবাসতেন আমায়। তার স্নেহ পেয়েছিলাম, আমি কত সৌভাগবতী। ভালোমানুষের ভালোবাসা পাওয়া একটা সৌভাগ্য নয় কি? তার দেওয়া ক্রোয়াটী আমি গলায় ঝুলিয়ে রেখেছি।

৭ই সেপ্টেম্বর

প্লুয়ারভাঁ প্রাসাদ। আমি এখন প্লুয়ারভাঁ প্রাসাদে। জায়গাটা আমার ভারী ভাল লাগছে। প্রাসাদটার উপর ছেয়ে রয়েছে যেন একটা গম্ভীর ভাব, যেন একটু বিষাদমাখা। বিষাদ ভাবটা যেন আমায় বিমর্ষ করে তুলছে। বেশ সুখে এখানে দিন কাটছে, যত সব ভাল ভাল জিনিষ এরা আমায় ব্যবহার করতে দিয়েছেন। কাল বিকেলে কঁন্ত ও তার ভাই আমায় আনতে গেসলেন—পিছনে এসেছিল তাদের গাড়ী। আমি বললাম "আমার হেঁটে যেতেই ভালো লাগে।"

বাবা হাসতে হাসতে একেবারে ফেটে পড়লেন—কেন গাড়ী দেখে ভয় করছে?

গাস্তঁ হাসলেন। তিনি আমায় বললেন "আমিও হেঁটে যেতে পছন্দ করি।"

পিতাকে আলিঙ্গন করবার সময় আমার চোখে জল এসে গেল।

—যা' মা, কাঁদিসনে। তোকে সব সময় দেখতে পাবোনা বটে, কিন্তু তাতে তোর ভালোই হবে।

ছাওয়ায় ছাওয়ায় যাবার জন্যে আমরা বনের পথ ধরলাম। আমার ডান দিকে কঁস্ত ও আমার বাঁদিকে তার ভাই। আমরা লুইয়ের কথা কইছিলাম। তিনি তার ইতিহাসটা জানতে চাইলেন। আমি গাস্তঁকে জিজ্ঞেস করলাম জানেৎকে পেয়ে তার মা সুখী হ'য়েছেন কি না। তিনি বললেন, তার মার মুখে জানেতের কাজের সুখ্যাতি আর ধরে না। আমাদের সম্মুখে সুন্দর দৃশ্যের উপর কঁস্ত আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলেন। কালো রঙের প্রাসাদ, অস্তমিত সূর্য্যের সিন্দুর বর্ণে স্নান করে রয়েছে। প্রাসাদের পিছনে একটী ছোট্ট পাহাড়, বৃক্ষে ও নল খাগড়ার ঝোপে ভরা। এখনও শরৎ তার সোনার রঙে গাছ-পালা রাঙিয়ে তুলতে আরম্ভ করেনি। গ্রীষ্ম এখনও সম্পূর্ণ রাজত্ব করে চলেছে। চারিদিক নিস্তব্ধ। কেবল পাখীর কাকলী আর পাহাড়ের পদতলে একটী নদীর কুলুকুলুধ্বনি আমাদের কানে আসছে। কঁস্তেস আমাদের অপেক্ষায় দরজার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি স্নেহভরে আমায় আলিঙ্গন ক'রে ঘরের ভিতর নিয়ে গেলেন।

—তোকে আমার প্রাসাদে পেয়ে আমার বড় আনন্দ হচ্ছে মা। হ্যাঁরে জুনোয়া, একে গাড়ী ক'রে নিয়ে এলি না কেন?

উনি চলতে ভালোবাসেন; আর ওর প্রস্তাবটাও আমার ভালো লাগলো সেই জন্যে আমি আর কিছু বললাম না,—কঁস্ত হাসতে হাসতে বললেন।

কঁস্তেস আমায় জিজ্ঞেস করলেন

—তুই হাঁপিয়ে পড়েছিস তো?

—মোটেই না। চলতে পেয়ে বরং আমার ভালোই হয়েছে। বনের ভিতরকার হাওয়া কি চমৎকার!

তারপর তিনি আমার বাবার সংবাদ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি

আমায় বললেন, তাঁর ভাই এসেছেন, তিনি সান্ধ্য ভোজনের পূর্বেই ফিরবেন, উপস্থিত কোথায় বেরিয়ে গেছেন।

—চল তোর ঘরে তোকে নিয়ে যাই। খাওয়া দাওয়ার পূর্বে তোর একটু বিশ্রাম করা দরকার।

তাঁর সঙ্গে গেলাম আমি "আমার ঘরটায়"। মাঠের মেঠো গন্ধে, আর জানালার উপর যুঁই গাছটার ফুলের গন্ধে ঘর ভরা। ঘরের সমুখেই একটী প্রকাণ্ড বাগান। দূরে, বহু দূরে একটী নীল রেখা সূর্য্যের আলোয় চকচক করছে, ওটা সমুদ্র! আমি চমৎকৃত হলাম। কঁস্তেসের কাছে ছুটে গিয়ে তাকে আলিঙ্গন করে বললাম:

—আমার ঘরখানা কি সুন্দর! আপনি বড় ভালো।

—যদি সম্ভব হয় সবই তোকে চিরকালের জন্যে দিয়ে দিতে পারি। তিনি হাসতে হাসতে বললেন:

—নিজের বাড়ীর মত মনে কর মারগেরীৎ। আমার আগেই যদি সাজ পোষাক হয়ে যায় তা হলে আমার জন্যে অপেক্ষা করিসনে, বসবার ঘরে নেমে যাস। তোকে দেখলে সকলের আনন্দ হবে।

এই বলে তিনি চলে গেলেন।

ঘরে আমি একা। ক্রোয়াবিদ্ধ জেষুর সমুখে নতজানু হয়ে অভ্যাস মত প্রার্থনা আরম্ভ করলাম। তার মনোমত কাজই যেন আমি পৃথিবীতে করতে পারি। "মঙ্গলময়! আমার সকল পাপ ক্ষমা কর!" প্রার্থনা শেষ করে উঠে জানলার কাছে গেলাম; তারপর নীল-বর্ডার-দেওয়া সাদা মুসেলীনের পোষাক পরলাম। এই পোষাকে বাবা আমায় দেখতে ভালোবাসেন। নীচে নেমে বসবার ঘরে প্রবেশ করতে যাচ্ছি এমন সময় দরজা খুলে একটী ভদ্রলোক বেরিয়ে এলেন, তার বয়েস ৫০ এর কাছাকাছি। মাথায় কতক চুল সাদা হয়ে গেছে,

চোখ দুটী ছোট ছোট কিন্তু জীবন্ত। আমায় দেখতে পেয়ে, কাছে এসে অনন্দের সঙ্গে বললেন :

—তোমায় আমি চিনি মাদমোয়াজেল, তোমার কথা আমি অনেক শুনেছি। তোমার কথা বলতে আমার বোনটীতো পাগল। এখন দেখছি সে মিছে বলে না। আমার নাম কলোনেল দেসৃক্লে।

মনে হলো তিনি আমার অন্তরের কথা পর্য্যন্ত যেন জানতে পারছেন। আমার পানে কিছুক্ষণ চেয়ে থেকে তিনি বললেন

—তোমায় বড় ভালো লাগলো। এস ভেতরে এস। আমার হাত ধরে তিনি বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর সঙ্গে পরিচয় হয়ে আমার ভারী আনন্দ হলো। আমার ধারণা ছিল তিনি রাশভারী আর কঠিনহৃদয়, এখন বুঝলাম আমার ধারণা ভুল। দেখলাম কঁন্ত ও তার ভাই ঘরের ভিতর রয়েছেন। ঘরের সব জানালা খোলা, মর্মর-মূর্তি-ভরা বাগান দেখা যাচ্ছে। মনে হলো কালোনেলের আমায় সত্যিই ভালো লেগেছে। জানেৎ বেশ আনন্দে আছে দেখে আমার আনন্দের সীমা রইলোনা। আমায় দেখে সে মিষ্টি হাসি হেসে কৃতজ্ঞতা জানালে।

৮ই সেপ্টেম্বর

আজ সকালে গেসলাম মা আর বাবার সঙ্গে দেখা করতে। ব্যাপারটা ঘটলো এইরূপ :

সকালে খাওয়া দাওয়ার পর কলোনেল আমায় জিজ্ঞেস করলেন আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি কি না। আমি উত্তর দিলাম "না" তিনি কঁন্তের দিকে ফিরে বললেন

—দুনোয়া ওকে ঘোড়ায় চড়তে শেখাস নি কেন ?

তার কথায় কঁন্ত আনন্দিত হয়ে উঠলেন।

—বেশ আজ থেকেই হাতেখড়ি হোক—অবশ্য মাদমোয়াজেল যদি রাজি থাকেন। ঘোড়ায় চড়ে আপনার মা বাবার সঙ্গে দেখা করতে যাবো।

—বেশ তো! সে তো ভারী চমৎকার কথা, কিন্তু···

—না না, এতে আর কিন্তু কি আছে। কলোনেল আমায় আর কথা কইতে দিলেন না।

তবু আমি বললাম—

—আমার চড়বার উপযুক্ত শান্ত ঘোঁড়া কি আপনাদের আছে?

—নিশ্চয়, কঁন্ত উত্তর দিলেন। বছর খানেক হলো আমার মা সাদা রংএর, ভ্যাড়ার মত নিরীহ একটি মেয়ে ঘোড়া কিনেছেন।

—ভাবী কঁন্তেসের জন্যে, না? কলোনেল হাসতে হাসতে বললেন।

কঁন্তেস হাসলেন। তাঁর ছেলে গেলেন সব যোগাড় করতে। গাস্তঁ জানালেন তিনি আমাদের সঙ্গে যেতে পারবেন না, তাঁর অন্য কাজ আছে। ঘোড়া দরজায় এসে দাঁড়ালো। কঁন্তের ঘোড়ার নাম সালাদ্যাঁ, কুচকুচে কালো রংএর ঘোড়া। গায়ে একটীও সাদা লোম নেই। প্রকাণ্ড ঘোড়া, চওড়া বুক। প্রভুর গলার সাড়া পেয়ে ঘোডাটা কান খাড়া করে চিৎকার করে উঠলো। আমার ঘোড়াটা তুষারশুভ্র, ঘাড়ের লোমগুলো লম্বা আর রূপোর মত চকচকে। সত্যি, ভেড়ার মত নিরীহ ঘোড়াটা। সালাদ্যাঁর পাশে দাঁড় করালে মনে হতো একটি বীর্য্য এবং পৌরুষের প্রতিমূর্তি, অপরটি সৌন্দর্য্য ও নম্রতার। ফাতিমাকে আমি আদর করতে লাগলাম। মনে হলো সে বুঝতে পারছে আমি ঘোড়া ভালোবাসি কারণ সে মৃদু চিৎকার করতে করতে

আমার হাত চাটতে লাগলো। কঁন্ত ঘোড়ার জিনটা ধরলেন, আমি ঘোড়ার উপরে উঠলাম। কলোনেল ঘোড়ায় চড়েই ছিলেন। কঁন্তেস আমাদের তাঁর শুভেচ্ছা জানিয়ে পুত্রকে বললেন :

· দেখিস দুনোয়া, মারগেরীৎ যেন বিপদে না পড়ে।

—কিছু ভেবনা মা, কঁন্ত উৎফুল্ল ভাবে উত্তর দিলেন।

তিনি আমায় জিজ্ঞেস করলেন, ঘোড়ায় চড়ে আমার কোন কষ্ট হচ্ছে কি না।

—বেশ আছি, আমি বললাম।

কঁন্ত আমার হাতে একটি সুন্দর চাবুক দিয়েছিলেন।

—বা···রে, আপনি তো বেশ ঘোড়ায় চড়ছেন!

আমি হাসলাম। প্রথম আমরা খুব ধীরে ধীরে চলেছিলাম। কিছু পরেই আমাদের ঘোড়া সলম্ফে দৌড়াতে লাগলো। পাছে কোন বিপদ ঘটে সে জন্যে কঁন্ত আমার পাশে পাশে চলেছিলেন। পরিষ্কার সকাল, সুনীল আকাশ, আমার আনন্দের আর সীমা ছিলনা। আমাদের বাগানের ফটকের কাছে এসে আমি ঘোড়া থেকে লাফিয়ে পড়লাম, কারো সাহায্যের প্রয়োজন হলো না। দৌড়ে গেলাম বাবাকে আলিঙ্গন করবার জন্যে। বাবা ফটকের কাছেই পায়চারি করছিলেন। তিনি বললেন।

—আরে! তুই! ঘোড়ার উপরে! ভারি সুন্দর মানিয়েছে তো। ঘোড়ায় চড়ে দুজন পুরুষ আর একটি মেয়েকে দেখে এই মাত্র ভাবছিলাম মাদমোয়াজেল গোসেরেল আসছেন তার দুজন সঙ্গীকে নিয়ে।

আমায় দেখে বাবার আনন্দ আর ধরে না। মা, কঁন্ত ও তার কাকাকে অভ্যর্থনা করবার জন্যে ছুটে এলেন। আমি ঘোড়ায় চড়ে

এসেছি শুনে তিনিও খুব খুসী হলেন। ঘণ্টা খানেক পরে প্রাসাদে ফিরলাম।

৯ই সেপ্টেম্বর

আজ বিকালে আমরা নদীর ধারে বেড়াতে গেসলাম। কঁস্ত নৌকা ভ্রমণ করবার ইচ্ছে জানাতে সকলে রাজী হলেন। কঁস্ত, তাঁর ভাই আর আমি নলখাগড়ায়-ভরা দুই তীরের মাঝখানে ভেসে বেড়াতে লাগলাম। কী সুন্দর, মনোরম দৃশ্য! দূরে দেখা যাচ্ছিল প্রাসাদের চূড়া, গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠেছে। আমাদের চারিদিকে নিস্তব্ধতা বিরাজ করছে। নিজেদের কথা ছাড়া আর কিছুই আমাদের কানে আসছিল না। মাঝে মাঝে এক একটা সোনালী ও নীল রঙের মাছ জলের উপর ভেসে উঠে আলোকরশ্মির মত জলের বুকে মিলিয়ে যাচ্ছিল। ঝোপের ভিতরে গোলাপ ফুলগুলো আমার ভারি ভাল লাগছিল। একটা তুষারশুভ্র গোলাপের দিকে আমি আত্মহারা হয়ে চেয়ে ছিলাম। তাই দেখে, কঁস্ত ফুলটা তুলে আনতে তীরে নেমে গেলেন। নদীর তীর ভীষণ ঢালু; তিনি পড়তে পড়তে কোন রকমে সামলে নিলেন—আমি চিৎকার করে উঠলাম। গাস্তঁ নদীর দিকে চেয়ে যেন স্বপ্ন দেখছিলেন, তিনি চমকে উঠলেন। কোন রকমে সামলে নিয়ে কঁস্ত নৌকার উপরে এলেন ফুলটি হাতে করে।

—আপনার মুখ যে একেবারে ফ্যাকাসে! অসুখ করেনি তো? তিনি ফুলটী আমার হাতে দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন।

—না, আপনাকে পিছলে পড়তে দেখে ভয় হয়েছিল তাই।

—কিন্তু আমি তো সাঁতার জানি। এখন গোলাপ দুটী আবার ফুটিয়ে তুলুন মাদমোয়াজেল; ঐ ফুলটার মত সাদা করে রাখবেন না—তিনি হাসতে হাসতে বললেন।

আমরা বাড়ী ফিরলাম। গাস্তঁ তার মা'কে আমাদের নৌকা ভ্রমণের কথা বললেন। আমি ভয় পেয়েছিলাম শুনে, তিনি "বাছারে" বলে আমায় তাঁর বুকের উপর টেনে নিলেন।

১০ই সেপ্টেম্বর

আজ সন্ধ্যায় আমরা বাইরে বসে সান্ধ্যভোজন শেষ করলাম। ঘরের ভিতর ভীষণ গরম। সিঁদুরে সমুদ্রের বুকে সূর্য্য তখন অস্ত যাচ্ছিল, সেই সময় কঁস্তেস ও তার ভাই ভিতরে প্রবেশ করলেন। আমরা বাইরেই রইলাম। রঙিন গোধূলি আমাদের বাইরে থাকবার জন্তে ডাকছিল। কয়েক মিনিট পরে গাস্তঁ তার হাতের ঘড়ির দিকে চেয়ে যাবার জন্তে উঠে পড়লেন। কঁস্ত তার পানে চেয়ে ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করলেন, মনে হ'ল তিনি যেন গাস্তঁকে কিছু বলতে চান, কিন্তু গাস্তঁ তখন অনেক দূর চলে গেছে। ফোয়ারার জলে রঙিন মাছগুলোর দিকে আমি একদৃষ্টে চেয়ে ছিলাম। কঁস্ত আমার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন—স্বপ্নাবিষ্টের মত। ছোট ছোট মাছগুলি তখন যুদ্ধ করছে।

—কি সুন্দর! আমি চিৎকার করে উঠলাম, কী সুন্দর!

—সুন্দর! সত্যি সুন্দর। জলের উপর আপনার মুখ খানি ভারী সুন্দর দেখাচ্ছে, তিনি হাসতে হাসতে বললেন।

—আমি কি তাই বলছি না কি? অনুযোগের সুরে বললাম—আমি তো সোনালী মাছ গুলোর দিকে চেয়ে ছিলাম; তাদের দেখে বলছিলাম কী সুন্দর।

—আমি চেয়েছিলাম জলে তোমার প্রতিবিম্বের দিকে। সুন্দর মনোহর তোমার মুখ খানি।

তাঁর কথায় আমার মুখ চোখ লাল হয়ে উঠলো, আনন্দও কম হয়নি।

তাঁর গম্ভীর অথচ হালকা আনন্দে ভরা গলার স্বর পাহাড়ের বুকে প্রতিধ্বনিত অস্পষ্ট আওয়াজের মত মিষ্টি শুনতে লাগছিল। রাত্রি নামছিল, আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলাম। কঁস্তেস আমায় গান গাইতে অনুরোধ করলেন. আমাদের দেশের গান। আমার গান শেষ হ'লে কলোনেল আমার গানের খুব প্রসংশা করলেন।

—তুমি গোলাপ কুঞ্জের বুলবুলিটীর মত গান গাও দেখছি। এইবার তোর পালা ছ'নোয়া। গান শোনা একটা।

কঁস্ত তার বেহালা তুলে নিলেন। তিনি অতি সুন্দর বেহালা বাজান। ভিক্তর হুগোর একটি গান বাজাতে লাগলেন। গানের সুরে সারা ঘর খানা ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো।

গান শেষ হ'লে কলোনেল বললেন :

—চমৎকার! গেল বছর তোর গান শোনবার পর তুই যে এতটা উন্নতি করেছিস তা জানতাম না।

গাস্তঁ প্রবেশ করলেন। আমরা তাকে গান গাইতে অনুরোধ করলাম।

তিনি আমাদের অনুরোধ এড়িয়ে গেলেন। রাত এগারটার পর আমরা যে যার ঘরে চলে গেলাম। আমি ঘরে প্রবেশ করে ক্রোয়ার নিচে নতজানু হয়ে বসলাম। আমি প্রার্থনা করলাম, "হে ভগবান আমার সকল পাপ ক্ষমা করো, আমায় ভুল পথ থেকে ফিরিয়ে নিয়ে এসো। হে মঙ্গলময় আমি তোমার সেবিকা, আমায় দয়া করো" জানলা খুলে বাইরের দিকে চাইলাম, সুউচ্চ বৃক্ষচূড়া গুলি চকচক করছে চাঁদের আলোয়। চারিদিক নিস্তব্ধ। কানে ভেসে আসছিল কেবল সুদূর সমুদ্রের গুরু গম্ভীর গর্জন। দূরে দেখতে পাচ্ছিলাম তরঙ্গের রূপালী মুকুট। কাল আমায় বাড়ী ফিরতে হবে,

কিন্তু কঁস্তেস আমায় ছাড়তে চান না। আরও দুদিন আমায় থাকতে হবে।

১১ই সেপ্টেম্বর

কঁস্ত ও গাস্তঁ দুজনে মিলে প্রাসাদের সব কিছু আমায় দেখালেন। প্রাসাদের গম্বুজের উপর উঠলাম। সেখানে আমরা বুরুজের উপর বসলাম। সেখান থেকে আমরা দেখতে পেলাম দূরে অস্তমিত রবি সমুদ্রের নীল বক্ষে নিমর্জিত হ'চ্ছে। কঁস্ত বললেন :

—এই গম্বুজ সম্বন্ধে একটা কিম্বদন্তি আছে—

—আমায় গল্পটা বলুন

গাস্তঁ পায়চারি করছিলেন, কঁস্ত আরম্ভ কবলেন :

—আমারই এক পূর্বপুরুষ—আঁরি প্ল্যুয়ারভ্যাঁ এই বাড়ীতে বাস করতেন। সে হলো দ্বাদশ শতাব্দীর কথা। বছরটা মনে নেই। তার একমাত্র কন্যা, বয়েস ষোল, অতি সুন্দরী, তেমনি মিষ্টি ছিল তার স্বভাব। কঁস্তের সেই মেয়েটাই ছিল একমাত্র আনন্দের জিনিষ। কঁস্তের এক পুত্রও ছিল, পুত্র তখন যুদ্ধে। একদিন ডিসেম্বর মাসে একটী যুবক ঘোড়ায় চড়ে প্রাসাদে এসে উপস্থিত হলো। তখন সন্ধ্যা হয়ে এসেছে। সকলে ছুটে গেল তাকে অভ্যর্থনা করতে এবং আশ্রয় দেবার জন্যে। বাইরে তখন ভীষণ শীত যুবকের সারা অঙ্গ তুষারে আবৃত। কাথারীন, সে যুগের ধারা অনুযায়ী এগিয়ে গেল যুবকের ওভারকোট খুলে নেবার জন্যে। কঁস্ত তার অতিথীকে আমন্ত্রন করলেন টেবিলে বসবার জন্যে। যুবকের বয়েস ২৪, ২৬-এর মধ্যে, কালো রংএর পোষাক পরা। মাথায় লোহার টুপি তা'তে একটী সাদা পালক গোঁজা। লম্বা চেহারা। কোঁকড়ানো চুল কপালের উপর এসে পড়ছে। কপালের উপর ক্ষত চিহ্ন। এ ক্ষত চিহ্ন ও তার

কালো গোঁফ তার সৌন্দর্য্যকে যেন আরও বাড়িয়েছে। কালো চিন্তাশীল দৃষ্টি দিয়ে সে মেয়েটীর পানে চেয়ে ছিল। মেয়েটী প্রথম দৃষ্টিতে তার প্রেমে পড়লো। মেয়েটীর নীল চোখের দৃষ্টি যুবকের উপর নিবদ্ধ হয়ে রইলো। সামান্য মাত্র প্রশংসায় তার নম্র এবং নিষ্কলঙ্ক মুখখানি লাল হয়ে উঠেছিল। কঁন্ত যুবককে প্রাসাদে কয়েক দিন রাখলেন। চলে যাবার সময় যুবক কাথারীনকে একটী শাদা গোলাপ দিয়ে বললে—'বিদায়'—না, 'আবার দেখা হ'বে'। কাথারীন এই চুড়োর উপর উঠে যতদূর দেখা যায় সেই যুবককে দেখতে লাগলো। সে ক্রমশঃ দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল। মেয়েটী নিজের ঘরে ফিরে শয্যায় শয়ন করলে। বিকেলের দিকে, বাবা তার মেয়ের দেখা না পেয়ে মেয়ের খোঁজে প্রাসাদের মন্দিরে প্রবেশ করলেন। জানলার শার্শি দিয়ে ঘরের ভিতর এসে পড়ছে চাঁদের ফিকে রূপালী আলো। কঁন্ত দেখলেন তার কন্যা বিছানার উপর উপুড় হয়ে শুয়ে। মুখ তার, হাতের সাদা গোলাপটীর মতোই রক্তহীন আর সাদা। তার সোনালী, আলুলায়ীত কেশের উপর চাঁদের আলো পড়ে, মনে হ'চ্ছিল তার মাথার চারদিকে এক আলোক জ্যোতির সৃষ্টি করেছে। কঁন্তের ইচ্ছে ছিল কন্যাকে জাগায়, কিন্তু মেয়েটী তখন মারা গেছে। একটা প্রবাদ আছে, তুনোয়া বলে চললো—যদি ডিসেম্বর মাসের কোন দিন কেউ চাঁদের আলোয় উজ্জ্বল প্রাসাদ শিখরের ঘরে প্রবেশ করে—তা'হলে কঁন্ত আঁরি যা দেখেছিলেন, তা দেখতে পাবে।

তখন সন্ধ্যা হ'য়ে গেছে, গাছের পাতায় পাতায় বাতাস দীর্ঘশ্বাস ফেলে চলেছে।

—আপনার ঠাণ্ডা লাগছে, কঁন্ত বললেন। তাঁ'র ওভার কোটটী

দিয়ে আমায় ঢেকে দিলেন।—ওঃ আপনার হাত যে একেবারে ঠাণ্ডা বরফ হ'য়ে গেছে। চলুন নিচে যাই।

আমরা নীচে নামলাম।

১২ই সেপ্টেম্বর

আজ সকালে কলোনেল পারী চলে গেলেন। তিনি কথা দিয়ে গেলেন যে ২০এ ডিসেম্বরের পূর্বে কঁস্তের জন্মোৎসবের দিন ফিরবেন। দরজার কাছে এসে তিনি আমার করমর্দন করে আমায় চুম্বন করলেন।

—আরে আমি বুড়ো হয়ে গেছি আমায় চুমু দেওয়ায় আপত্তি কি! হ্যাঁ ঐ তুনোয়া চাইলে অবশ্য ব্যাপারটা অন্য রকম দাঁড়াতো।

এই কথা বলে তিনি হাসতে লাগলেন। আমার ভীষন লজ্জা করতে লাগলো। আমি কাল যা'বো। বাবা আর মার কাছে থাকবো এ কথা চিন্তা করলেও আনন্দ হয়। নভেম্বর মাসে কঁস্তের জন্মোৎসব, আসবার জন্যে কঁস্তেস আমায় অনুরোধ করলেন। কঁস্তও হাসতে হাসতে বললেন—

আপনি আসবেন? বুঝতেই তো পারছেন আপনাকে ছেড়ে আমরা থাকতে পারবো না। নয় মা?

সে কথা আর বলতে বাছা। তুই আসবি, আসবি তো মার-গেরীৎ?

আমি কথা দিলাম।

১৩ই সেপ্টেম্বর

একলা আমি আমার ঘরে। ঘরের ভিতর সাদা মশারী ঢাকা আমার বিছানা। আমি একটী ঠেবিলের উপর বসে দিনপঞ্জি লিখছি।

ঘরের জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সবুজ ঘাসে-ভরা মাঠ। কঁস্ত ও তার ভাই আমায় বাড়ী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে গেছেন। বাবা আমাদের অপেক্ষায় দরজায় দাঁড়িয়ে ছিলেন; তার বুকে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমি তাকে জড়িয়ে ধরলাম।

তোকে দেখলে লোকে কি বলবে বলতো?—যেন কতদিন আমাদের কাছ ছাড়া। কে বলবে তুই মোটে সাতদিন আমাদের কাছ ছাড়া হয়ে ছিলি। এই কথা বলতে বলতে বাবার চোখে জল এলো।

মা তাঁর ঘরে ছিলেন। তাঁর খোঁজে দৌড়ালাম। তিনি আশ্চর্য হ'য়ে আমায় আলিঙ্গন করে বল্লেন:

—আমি ভেবেছিলাম তুই বিকেলের দিকে আসবি। কার সঙ্গে এলি?

—কঁস্ত আর গাস্তঁ।

তিনি নিচে নামলেন, আমি তাঁর পিছু পিছু গেলাম। কঁস্ত তাঁর মার একখানা চিঠি আমার মা'র হাতে দিলেন। চিঠিতে তিনি অনুরোধ করেছেন কঁস্তের জন্মোৎসবের দিন আমাকে পাঠিয়ে দিতে। মা নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। কঁস্ত ও তাঁর ভাই চলে গেলেন। আমি গেলাম আমার ঘর সংসার দেখতে। খরগোসগুলোকে দেখে আমার লুইয়ের কথা মনে পড়লো। খেতে বসে বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম তিনি লুইয়ের কোন সংবাদ পেয়েছেন কি না।

মা'র পানে চেয়ে তিনি বললেন "আজ সকালেই তার চিঠি পেয়েছি"

—তার অসুখ করেনিতো?

—না।

—তিনি এখন কোথা বাবা?

—কর্স-এ

—সত্যি ? কেমন লাগছে তাঁর সে দেশ ? পড় না বাবা তাঁর চিঠিখানা।

সে কেবল আমাদের কথাই লিখেছে—কত আনন্দে এখানে তার দিন কেটেছে সেই কথাই সে কেবল বলেছে।

চিঠিখানা ভাঁজ করে তিনি পকেটে রাখলেন। শুতে আজ অনেক দেরী হলো কারণ অনেক কথা আমাদের বলবার ছিল।

১০ই সেপ্টেম্বর

কাল বিকেলে কঁস্ত খোঁজ নিতে এসেছিলেন, এতদূর চলে এসে আমার কোন কষ্ট হয়েছে কি না। কিছুদিন পূর্বে মা পারী থেকে কয়েকটি ওষধি গাছ আনিয়েছেন, কঁস্তকে সেগুলি দেখাতে লাগলেন। কঁস্ত মাকে লুইয়ের খবর জিজ্ঞেস করলেন।

—তাকে আবার দেখতে পেলে আমার ভারী আনন্দ হ'বে। তার মত ভালো মানুষ বড় একটা দেখতে পাওয়া যায় না। তার হাসি ও সরলতা ভরা মুখ আমার বড় ভালো লাগে।

—অক্টোবর মাসে সে এখানে আসবে।

—সত্যি ? আমার ভারী আনন্দ হবে। আমার মার সঙ্গে তার পরিচয় ক'রে দেবো।

মা কঁস্তকে লুইয়ের ইতিহাসটা সব বললেন। কঁস্ত একমনে মার কথা শুনতে লাগলেন। তাঁর মুখমণ্ডল চিন্তাযুক্ত, নিষ্পলক চোখে আমার মার মুখের দিকে চেয়ে রয়েছেন।

—হায়রে হতভাগ্য যুবক ! তার এই করুণ ইতিহাস শুনে আমার সহানুভূতি তার উপর আরও বেড়ে গেল। তিনি কাপিতাঁন ! এত কম বয়েসে !

হৃদ্দ কুড়ি বছর তার বয়স। তার রেজিমেন্টার কাপিত্যানদের মধ্যে তার বয়েস সবচে কম, মা গর্বভরে বললেন।

কয়েক মিনিট পর কঁস্ত বিদায় নিলেন।

১৭ই সেপ্টেম্বর

আমার "অস্ট্রেলিজ" ঘোড়াটা কী সুন্দর। আমাকে ঘোড়ায় চড়তে দেখে বাবা পারী থেকে ঘোড়াটা আমার জন্যে আনিয়েছেন। ঘোড়াটা ভেড়ার মত শান্ত। আমায় দেখলেই চিনতে পারে। কাল ঘোড়াটা এখানে পৌঁছেচে, আর আজ আমরা সারা গাঁ খানা চষে ফেলেছি। ঘোড়াটা কি সুন্দর লাফ দিয়ে দৌড়ায়-যেন হাওয়ার মত। বাবার ও আমার কঁস্তের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। তিনিও ঘোড়াটার খুব সুখ্যাত করে, আমায় বললেন

—দেখে মনে হচ্ছে, বনদেবী বুঝি শীকার করে ফিরছেন।

১৮ই সেপ্টেম্বর

আজ দিদিমণি ভেরনিকের চিঠি পেলাম। তাঁর অসুখ, ভীষণ অসুখ, বাঁচবার আশা নেই। যত শীঘ্র সম্ভব তিনি আমায় দেখতে চান। চিঠি-খানা ছোট, কিন্তু যিনি লিখেছেন মনে হয় তাঁর মনে যেন শান্তি ভরা। হায়রে হতভাগী! ভরা যৌবন, মোটে ২৬ বছর বয়েস, এই কি মরবার সময়! ভগবানের দান-গৌরবে ভরা পৃথিবী ছেড়ে যাবার এই কি সময়? বাবা আমায় যাবার অনুমতি দিলেন, মা চিঠি পড়ে কাঁদতে লাগলেন। দশটার সময় আমি রওনা হলাম।

২১এ সেপ্টেম্বর

আঠার তারিখে বিকেলে এসে পৌঁছালাম Mater Dolorosa কুভাঁয়। রোগিণীর ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি বিছানায় শুয়ে, মৃদু হেসে

আমায় কাছে আসতে বললেন। তাঁর মাথার কাছে আমি নতজানু হয়ে বসলাম। তিনি আমায় চুম্বন করলেন। কি বিচ্ছিরী ফ্যাকাশে তাঁর মুখের চেহারা! হাতে হাতীর দাঁতের ক্রোয়াটী রয়েছে। আমি তাঁর অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললাম। "মারগেরীৎ তুই তাহলে সত্যি আমায় ভালোবাসিস্"---তিনি ক্ষীণ স্বরে বললেন। আমার মাথার চুলের ভিতর হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন।

—কাঁদিসনে মা, স্বর্গে গিয়ে আমি কত সুখী হবো! সেখানে আবার আমাদের পরিচয় হবে। পৃথিবী তো দুঃখে আর বেদনায় ভরা। আমার "পিতার" কাছে! 'সেখানে কষ্ট নেই, করুণ ক্রন্দন নই, কাজ নেই'। ভগবান নিজের হাতে করে আমাদের চোখের জল মুছিয়ে দেন।

তিনি চুপ করে, একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন ভগবানের নিদর্শন স্বরূপ ক্রোয়াটির দিকে। তিনি আবার বল্‌লেন "মারগেরীৎ এই ক্রোয়ার দিকে চেয়ে দেখ। কতবার এই ক্রোয়া যে আমায় সান্ত্বনা দিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। আমার ইচ্ছে, শেষ সময়েও যেন ক্রোয়াটি আমার সঙ্গী হয়ে থাকে!"

আমার চোখের জলের বাঁধ ভেঙ্গে গেল।

এই পৃথিবীর কাছ থেকে বিদায় নিতে আমার একটুও দুঃখ নেই। এ জীবনে আমি বড় কষ্ট পেলাম। এইবার আমার দেখা হবে আমার বাবা আর মার সঙ্গে—ব্যার্ণার-এর সঙ্গেও দেখা হবে।

সারারাত আমি তাঁর ঘরে রইলাম দিদিমণি দরকাও আমার সঙ্গে

জাগলেন। ভেরনিক দিদিমণি মরে সুখ পাবেন! আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।

কোন দিন যায় হরষে
যায় কোন দিন বিফলে

আজ পর্যন্ত দুঃখের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। পৃথিবী আমার চোখে কত সুন্দর। সকালবেলা, ঊষার আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে দিদিমণি ভেরনিক আমায় ডাকলেন।

—মারগেরীৎ আছিস?

—আছি দিদিমণি।

—কাছে আয় তোকে চুম্বন দেব।

আমি কাছে আসতে তিনি নিজের হাতের মধ্যে আমার একখানা হাত নিলেন। মনে হলো এরই মধ্যে তাঁর হাতখানি শীতল হয়ে গেছে।

—বোন ক্ল্যার,—ক্ল্যার তাঁর মাথার কাছে বসে ছিলেন—জানলাটা খুলে দে, আর একবার সূর্যের আলো দেখে নি। ক্ল্যার দরজা খুলে দিলেন। ঊষার নির্মল আলোয় ঘর ভরে গেল। দিদিমণি ভেরনিক সূর্যের পানে চেয়ে রইলেন। উদিত সূর্যের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো তার মুখমণ্ডল।

—এবার আমি দেখতে পাবো সবচেয়ে সুন্দর দিন। সেখানে সূর্যের আলো নিয়ে আসে স্বাস্থ্য।

মনে হলো তিনি দুটি হাত জুড়ে প্রার্থনা করছেন। তিনি দিদিমণি ক্ল্যারকে বললেন

—বোন, আমি একবার "পিতা" অগুস্ত্যাকে দেখতে চাই।

দিদিমণি ক্ল্যার বেরিয়ে গেলেন। দিদিমণি ভেরনিক আবার আমার একখানি হাত তাঁর হাতের মধ্যে নিলেন—মারগেরীৎ তোকে হয়তো কত কষ্ট দিয়েছি সেজন্যে তুই আমায় ক্ষমা করেছিস তো ?

—কিন্তু দিদিমণি, আপনি তো আমার সকল সুখের কারণ। আমিই তো আপনার কাছ থেকে ক্ষমা চাইব,—আমি চোখের জল ফেলতে ফেলতে বললাম।

"পিতা" এলেন। তিনি রোগীর কাছে নতজানু হয়ে প্রার্থনা করলেন। আধ ঘণ্টা কেটে গেল। তাঁর নিশ্বাস পড়ছিল কি না বুঝতে পারা যাচ্ছিল না, চোখ দুটি নিমিলিত। পিতা একটু থামলেন। দিদিমণি চোখ বুজে মৃদুস্বরে বললেন "জেষু! আমার ত্রাণকর্তা" তাঁর আত্মা নশ্বর দেহ ছেড়ে চলে গেল। "পিতা" উঠলেন।—আমাদের বোন বিশ্রাম করতে চলে গেছেন। ভগবান তাঁর আত্মাকে গ্রহণ করুন।

মৃতদেহ কবরে দেবার সময় আমি উপস্থিত ছিলাম। তাঁকে দেখলাম কফিনের ভিতর। বুকের উপর হাত দুটি ভাঁজ করা রয়েছে, হাতে ক্রোয়া। তাঁর মুখমণ্ডল অদ্ভুত আলোকে উদ্ভাসিত। দেখলে মনে হয় না তিনি মৃত—মনে হয় তিনি নিদ্রিত। ধব্ধবে সাদা তাঁর পোষাক। ধীরে ধীরে আমার দুচোখের জল ঝরে পড়ছিল। মনে হলো স্বর্গের দেব দূতেরা মৃতার ঘরে নেমে এসে মৃতাকে পাহারা দিচ্ছে। একে একে দিদিমণিরা তাঁদের উপহার দিদিমণি ভেরনিকের উপর রাখলেন। সকালবেলা আমি একটা পদ্মফুল যোগাড় করে এনেছিলাম, সেই ফুলটি আমি মৃতাকে উপহার দিলাম। সাদা বাতিগুলি জেলে দেওয়া হলো, সকলে প্রার্থনা সুরু করলেন।

আমি বাড়ী ফিরলাম। আগেই বলেছি দিদিমণি ভেরনিক ছিলেন আমার বোনের মত। কুভাঁয় তিনি ছিলেন আমার সাথী ও

শিক্ষয়িত্রী। এখনও আমার কানে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে তাঁর 'এভাঁজিলের' কথাগুলি। আমার মনে হ'তো তিনি স্বর্গের দেবী, পৃথিবীতে বাস করবার যোগ্য তিনি ছিলেন না। পৃথিবীতে তিনি বড় কষ্ট পেয়েছিলেন, দয়া করে ভগবান তাঁকে ডেকে নিলেন। তাঁর প্রশংসায় স্বর্গ পর্যন্ত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো।

২৩এ সেপ্টেম্বর

আজ সকালে বুড়ো কোর‍্যান ও তার স্ত্রীকে দেখতে গেলাম। ছোট্ট কুঁড়ের কাছে এগিয়ে যেতে দেখতে পেলাম, কে যেন কুঁড়ের ভিতর থেকে বার হ'লো। গাস্তঁ গরীব লোকেদের খোঁজ নিচ্ছেন দেখে আমার ভারী আনন্দ হ'লো। সে কথা তাকে বলতে তিনি লজ্জিত হয়ে পড়লেন। বাবা আর মায়ের সংবাদ জিজ্ঞাসা করে তিনি চলে গেলেন। জানেৎকে আমি ঘরের ভিতর দেখতে পেলাম। তাকে দেখে একটু আশ্চর্য হলাম, একটু আনন্দও হলো। বুড়ো ও বুড়ী দুজনে গাস্তঁর কথাই কইছিল। জানেৎ চট্ করে আমায় একখানা চেয়ার এনে দিলে। জানেৎ যেদিন থেকে প্রাসাদে নিযুক্ত হয়েছে সেদিন থেকে তাদের অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে। কোর‍্যানের বাবা আবার আমায় নতুন করে ধন্যবাদ দিলেন। আমি উঠে পড়লাম। "এত করে ধন্যবাদ দিলে কিন্তু আমি চলে যাবো" হাসতে হাসতে বললাম। তিনি চুপ করলেন। অনেকক্ষণ পরে আমি সেখান থেকে চলে এলাম।

২৪এ সেপ্টেম্বর

সকাল বেলা খাওয়ার আগেই আমি আর বাবা বেড়াতে বার হলাম। মাঠের উপরে শুভ্র শিশির বিন্দু। অন্ধকার বনের ভিতর থেকে বেরিয়ে হঠাৎ আমরা পড়লাম সূর্যালোকে উদ্ভাসিত মাঠের উপর। সেই

মাঠের শেষের পাহাড়ের উপর উঠলাগ। নীচে দেখলাম গ্রাম, আমাদের প্রাচীর বেষ্টিত বাড়ী—প্ল্যুয়ারভ্ঁ্যা প্রাসাদের সুউচ্চ শিখরদেশ। সুদূরে বিস্তৃত সমুদ্র, সকালের সূর্য্যের আলো পড়ে যেন তার প্রশান্ত বুকে সহস্র তারকা ঝিক ঝিক করছে। খাওয়ার সময় আমরা বাড়ী ফিরলাম। মা আমাদের জন্যে দোরগোড়ায় অপেক্ষা করছিলেন। তিনি বাবার হাতে একখানা চিঠি দিয়ে বল্‌লেন "লুইয়ের"। বাবা চিঠিখানি পকেটে ফেললেন। আমি একটু আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। তিনি তো লুইয়ের চিঠি পাবামাত্র খুলে পড়েন! আমার ক্ষিদে পেয়েছিলো—টেবিলে বসলাম।

২৫এ সেপ্টেম্বর

আজ কঁস্ত দেখা করতে এসেছিলেন! তিনি এসে মার কাছ থেকে অনুমতি চাইলেন আমায় নিয়ে যাবার জন্যে,—তাঁর মাকে সাহায্য করতে হবে উৎসবের যোগাড় করতে। তিনি যখন এলেন, তখন মা গোসেরেল ও তার মেয়ে এসেছিল। কঁস্ত আমায় জিজ্ঞাসা করলেন রোজ ঘোড়ায় চড়ি কি না।

—নিশ্চয়, চড়ি বই কি

—চল তবে তোমার সঙ্গে বেড়িয়ে আসি।

—বাঃ বেশতো—মা গোসেরেল হাসতে হাসতে বললেন—আমি যেই এলাম আপনি চল্‌লেন।

কঁস্ত কোন উত্তর দিলেন না। মা গোসেরেল বললেন—প্রায় এক যুগ হলো আমি আপনাকে আমাদের বাড়ীতে দেখিনি।

—সত্যি, আমার বিন্দুমাত্র অবসর নেই, কঁস্ত উত্তর দিলেন। পোষাক পরবার জন্যে আমি ঘরের ভিতর প্রবেশ করলাম। আমি আসতে জুনোয়া উঠলেন।

—চল এপসঁ পর্যন্ত বেড়িয়ে আসা যাক।

বাবা জুতোটা বদলে আনতে গেলেন। তিনিও আমাদের সঙ্গে যাবেন। মাদমোয়াজেল গোসেরেল আমাদের বিদায় দিতে এলো। কঁস্তের সাহায্যে আমি ঘোড়ায় উঠলাম, তারপর তিনি নিজের ঘোড়ায় উঠলেন। মা গোসেরেল হাসতে হাসতে বললেন :

—তোমাদের দেখে সকলে বলবে গাঁয়ের সৈনিক। মারগেরীৎ তোকে দেখে মনে হয় তুই একজন মেয়ে সৈনিক। আমি যখন ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে যাবো আমার সঙ্গে তোর যাওয়া উচিত।

বাবা শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন। আমরা বেরিয়ে পড়লাম। ওঃ আমার কী আনন্দ! পাশের গ্রাম পর্য্যন্ত এসে পৌছালাম। তিন ঘণ্টা বাদে আমরা বাড়ী ফিরলাম। কঁস্ত আমাদের বাড়ীর দরজা পর্য্যন্ত এসে বিদায় নিলেন।

২১এ সেপ্টেম্বর

আজ গাঁয়ের স্কুল মাষ্টার ও তার স্ত্রীর সঙ্গে আমি ও আমার মা দেখা করতে গেলাম। তারা নদীর ধারে বাস করেন। স্বামী মাসে ১৬০ ফ্রাঁ রোজগার করেন। স্ত্রী ঘরদোর আর ছেলেপুলের দেখা-শোনা করেন। তাদের তিনটি সন্তান। বড়টির বয়স আট বছর; বেশ বড-সড়, শান্ত, বাপের সঙ্গে সঙ্গে থাকে। তার পরে একটি সুন্দরী মেয়ে, বয়স ৬ বছর, নাম হেলেন। হেলেন তার ভাই ক্লদকে খুব ভালোবাসে। ছোটটীর বয়েস দু' বছর, গোলাপ ফুলটীর মত ফুটফুটে। আমরা তাদের বাড়ীতে প্রবেশ করলাম। মা ভালপয়েন আমাদের সযত্নে অভ্যর্থনা করলেন। তাঁর স্বামী তখন ক্লদকে নিয়ে স্কুলে গেছেন। বাবা গেছেন শিক্ষা দেবার জন্যে আর ছেলে গেছে শিক্ষা পাবার জন্যে। মা ভালপয়েন আমার মা'কে বাগান দেখাতে নিয়ে

গেলেন, আমি ছোটটীর সঙ্গে রইলাম, সে তখন দোলনায় শুয়ে হাসছে। আনন্দে হাততালি দিতে দিতে হেলেন ঘরের ভিতরে এলো।

—আমার জন্যে চকোলেট আর মিঠাই এনেছেন ?

সে আমার কোলের উপর বসে আমার পকেট অনুসন্ধান করতে লাগলো। যা সে খুঁজছিল, তা সে পেলে এবং পরিবর্তে আমায় একটী চুম্বন দিলে, লালটুকটুকে অধরে।

—যাই মেঠাই খাইগে, সে আনন্দে উৎফুল্ল হয়ে' বললে।

সব খেওনা, ক্লদের জন্যে অর্ধেক রেখো। পড়াশোনার পর মিষ্টি পেলে তার আনন্দ হ'বে। ক্লদের অংশ সে আলাদা করে রেখে দিলে।

—মা সেদিন বারণ করেছিলেন বেশী মিঠাই খেতে। তিনি বলেন বেশী মিঠাই খেলে অসুখ করবে—আপনি কি বলেন ?

—নিশ্চয়। বেশী খেলে অসুখ তো হবেই। তোমার কি ইচ্ছে অসুখ করে ?

না। বাবার সেদিন অসুখ করেছিল, সমস্ত দিন তিনি বিছানায় পড়ে রইলেন, চোখ বুজে। মাঝে মাঝে কেঁপে উঠতে লাগলেন এবং গোঙাতে লাগলেন। মা বললেন বাবার একটু জিরুনো দরকার···কিন্তু! কই তিনি তো বারণ করলেন না মিষ্টি খেতে!

প্রায় আধ ঘণ্টা আমরা সেখানে রইলাম। ক্লদ ও তার বাবা ঘরে ঢুকতে হেলেন আমার কোল থেকে নেমে ছুটে গেল ক্লদকে মিঠাই দিতে। মঃ ভালপয়েন আমার করমর্দন করলেন। তিনি তার ছেলে মেয়েদের যথেষ্ট স্নেহ করতেন। যারাই তার প্রতি একটু অনুকম্পা দেখাতো তাদেরই তিনি বন্ধু করে নিতেন।

—ওঃ মাদমোয়াজেল দারভ্যার আপনি আমার মেয়েটাকে আদুরে করে তুলছেন। আপনাকে ও এত ভালবাসে যে ওর মুখে আপনার কথা আর ধরে না। ছেলেদের প্রতি আপনার ব্যবহার দেখে বোঝা যায় আপনার মন বড ভালো। আমার ছেলেমেয়েরাও বুদ্ধিমান বড় কম নয়। আপনাকে বন্ধু বলে চিনে নিতে ওদের একটুও দেরী হয় নি।

তিনি বাচ্চাটিকে দোলনা থেকে কোলে তুলে নিলেন "এর শরীরটা বুঝি ভালো নেই" ? তিনি ছেলেটাকে আদর করতে করতে বললেন।

সত্যি, ছেলেটাকে ভারী সুন্দর দেখতে। কোঁকড়ান চুল, লাল টুক টুকে দুটী ঠোঁট, কালো ঢলঢলে চোখ। আধঘণ্টা পর আমরা বাড়ী ফিরলাম। মা বললেন, কঁস্ত, তার মা, ও তার ভাই প্রায় স্কুল দেখতে যান। কঁস্ত সত্যি বড় ভালো, সব দিকেই তাঁর নজর আছে। কাল মাদাম গোসেরেলের সঙ্গে আমরা চড়ুইভাতি করতে যাবো।

২৮এ সেপ্টেম্বর

কাল গোলাপ-কুঞ্জে আমরা চড়ুইভাতি করতে গেসলাম। যখন সেখানে গিয়ে পৌছালাম, অনেকেই তখন এসে গেছেন, কিন্তু কঁস্তকে দেখতে পেলাম না ; তাঁর মা ও তাঁর ভাই কেউই আসেন নি। মাদমোয়াজেল গোসেরেল আমায় অভ্যর্থনা করে আমায় নিয়ে পড়লেন।

যাঁরা এখানে আছেন সকলেই তোমার বন্ধু এদের সঙ্গে তোমার আর পরিচয় করিয়ে দেবার প্রয়োজন নেই।

তার এক আত্মীয় বাবার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলেন।

ভদ্রলোকের নাম মঁসিয়ে লাঁস। তিনি আমায় দেখতে পেয়ে বল্‌লেন :

—এ'টী তোমার মেয়ে জেনেরাল ?

—হ্যাঁ, আমার বাবা উত্তর দিলেন।

তিনি আমায় নমস্কার করলেন।

একটা ঝোঁপ পার হ'য়ে তিনি নিয়ে গেলেন Druid সভ্যতার নিদর্শনপূর্ণ একটী স্থানে। তিনি Druid সভ্যতার সমস্ত খুঁটিনাটি একটী একটী করে আমাদের বোঝাতে লাগলেন। লোকটী খুব জ্ঞানী, আমি তাঁর কথা বোঝবার চেষ্টা করলাম। তাঁর কথা আমার ভাল লাগছে সে কথা বুঝতে পেরে তিনি আনন্দিত হলেন। মদ-মোয়াজেল গোসেরেল আমাদের সঙ্গে যোগ দিলেন।

—রক্ষে কর মামা—তোমার কথাগুলো শুনতে শুনতে মেয়েটা যে বিরক্তিতে মারা পড়বার যোগাড় হয়েছে

—না না—আমার খুব ভালো লাগছে, আমি বল্‌লাম। আমরা নানা জিনিস সম্বন্ধে কথা কইতে লাগলাম। সেই সময় আমি কঁস্তেসের গলার আওয়াজ পেলাম।

—আমাদের দেরী হলো সে জন্যে ক্ষমা করবেন। জুনোয়ার অনেক কাজ শেষ করতে বাকী ছিল।

আর একটী গলার স্বর আমার কানে এলো, চিনতে পারলাম সঙ্গে সঙ্গে।

—মাদমোয়াজেল দারভ্যার আসেন নি ?

—নিশ্চয় এসেছেন, তিনি তার বাবার সঙ্গে রয়েছেন।

আমি এসেছি কিনা তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি আনন্দে লাল হয়ে উঠলাম। তখন মাদমোয়াজেল গোসেরেল বা মঁঃ লাঁসের কথা

আমার আর কানে ঢুকছিল না। একটি হাত আমার কাঁধের উপর পড়লো, আমি ফিরে চাইলাম—দেখলাম বাবা আমার কাঁধের উপর হাত রেখেছেন। তিনি নিশ্চিন্ত মনে মাদমোয়াজেল গোসেরেলের কথা শুনছিলেন। পর মুহূর্তে ঝোপ ফাঁক করে 'তিনি' দেখা দিলেন।

—শেষ পর্যন্ত আপনার দর্শন পেলাম—চারিদিকে আপনাকে খুঁজে বেড়াচ্ছি।

মাদমোয়াজেল গোসেরেল এসে হাজির হতে, করমর্দনের পালা সুরু হলো। বাবা বললেন।

—যা কঁন্তেসের সঙ্গে দেখা করে আয়।

আমি সরে পড়লাম, কঁন্ত আমার পিছু নিলেন।

—তোমার অষ্ট্রেলিজ কেমন আছে?

—ভালো, ধন্যবাদ।

—আমরা কঁন্তেসের কাছে এলাম। তিনি আমার করমর্দন করে কপালে চুম্বন করলেন

—তোকে কী সুন্দর দেখতে,—নয় জুনোয়া?

তিনি জুনোয়ার পানে চাইলেন

—তা আর বলতে মা, তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন। মনে হ'লো কঁন্তেস খুশি হ'লেন। তিনি জুনোয়ার কপালে চুম্বন করলেন।

—তুইও ভালো ছেলে, যা হলোতো?

আমার হাত ধরে তিনি নিয়ে চললেন নদীর ধারে যেখানে সকলে বসেছিলেন। মাদমোয়াজেল গোসেরেল আমার কাছে বসলেন।

—তোর নাম মারগেরীৎ না রেখে রোজ রাখা উচিৎ ছিল, তিনি হাসতে হাসতে বললেন,—কারণ গোলাপের মত তোর রং।

মাটির উপর সাদা চাদর পাতা হয়েছিল। তার উপরে আমরা সকলে বসলাম। গাস্তঁ আমার বাঁ দিকে বসে ছিলেন। মাদমোয়াজেল গোসেরেল ছিলেন আমার ডান দিকে; তার ডান দিকে ছিলেন কঁস্ত, বাবা বসেছিলেন কঁস্তেসের কাছে, আর মা'র কাছে ছিলেন জ্ঞানী লোকটি। আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতে পারেন না বলে গাস্তঁ ক্ষমা চাইলেন 'অনেক কাজের' দোহাই দিয়ে।

দিনটা বেশ আমোদে কাটলো। বিকেলে কঁস্তেস, কঁস্ত, তার ভাই ও আমরা সকলে এক সঙ্গে ফিরলাম। বাবা যেন একটু চিন্তিত বলে মনে হ'লো। আমি শুনতে পেলাম বাবা আর মা ঘরের ভিতর কথা কইছেন। শীঘ্রই আমি ঘুমিয়ে পড়লাম। কিছুক্ষণ পরে মনে হ'লো যেন স্বপ্নে একটা শব্দ আমার কানে এলো। দেখলাম আমার মা আমার উপর ঝুঁকে পড়ে আলতো ভাবে আমার কপালে চুম্বন করলেন। আমি তার গলা জড়িয়ে ধরলাম।

—মা, আমার মা মনি—আমি অর্ধ-জাগ্রত অবস্থায় বললাম। তিনি চলে গেলেন; আমি গাঢ় নিদ্রায় নিদ্রিত হ'লাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখতে লাগলাম।

আজ মাসের শেষ দিন। কুভাঁয় গেলাম দিদি ভেরনিকের গোর দেখতে। মাটি ঘাসে ঢাকা পড়ে গেছে। মর্মর ক্রুসের উপর লেখা রয়েছে "ভগিনী স্যার ভেরনিকের স্মৃতি স্তম্ভ, বয়স ২১ বছর।"

"যে কাঁদে সে সুখী কারণ তারই জন্যে আনন্দ", হায়! তিনি অনেক কেঁদেছেন, যুবতী সন্ন্যাসিনী, অনেক দুঃখ পেয়েছেন। পৃথিবীতে যাঁদের তিনি ভালোবেসেছিলেন, স্বর্গে তাদের সঙ্গে দেখা হ'য়ে তাঁর কত আনন্দই না হচ্ছে। তাঁর ঘরের কথা কইতে কত ভালোবাসতেন;

আমার কাছে তার সব সুখ দুঃখের কথা বলতেন। কত দুঃখের সহিত তিনি বলতেন, কিন্তু নিরাশ হ'ন নি কখনও, কারণ তিনি জানতেন তাঁর প্রিয়জনের সঙ্গে পুনরায় দেখা হবে। ওগো স্বর্গের দেবী ভগবানের কাছে আমার জন্যে প্রার্থনা কোরো।

কঁস্ত ও তার ভাইয়ের সঙ্গে দেখা হ'লো ফিরতি মুখে, সেন পার্কে। তাঁরা মাছ ধরে ফিরছিলেন। মাছে মাছে জাল ভার্তি। তাঁরা আমর সঙ্গে আমাদের বাড়ী পর্যন্ত এলেন এবং সেখান থেকে তাঁরা বিদায় নিলেন।

১লা নভেম্বর

আজ কঁস্ত ও তার ভাই এসেছিলেন আমার সঙ্গে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াবার জন্যে। হঠাৎ বৃষ্টি নামলো, বাবা তার চওড়া টুপি খুলে আমার মাথায় চাপা দিলেন। আমি হাসতে হাসতে তাকে বললাম।

—আমার কি বৃষ্টিকে ভয় করছে না কি—অস্ত্রেলিজকে ছুট করালাম তারাও তাদের ঘোড়া ছুটালেন। বায়ু আরো জোর গর্জন করে উঠলো, বৃষ্টির বড় বড় ফোঁটা পড়তে লাগলো—আমার হাড় পর্যন্ত ভিজে উঠলো। ঘোড়াটার গা দিয়ে যেন চকচকে মুক্ত ঝরে পড়তে লাগলো। যখন আমরা বাড়ী এসে পৌছালাম, দেখলাম মা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছেন। আধঘণ্টা বাদে বৃষ্টি থামলো। সুর্য পুনরায় দেখা দিতে, কঁস্ত ও তার ভাই আমাদের কাছে বিদায় নিলেন।

৪ঠা নভেম্বর

কঁস্তেস আজ বিকালে এসেছিলেন। তিনি এসেছিলেন মা'র অনুমতি নিয়ে আমায় প্রাসাদে নিয়ে যেতে, উৎসবের জোগাড় করবার জন্যে। আনন্দের সহিত মা অনুমতি দিলেন। ঠিক হ'লো আমি প্রাসাদে

যা'বো ১৬ তারিখে সকাল দশটার সময় এবং ফিরবো বিকেলে। থেরেস, আমাদের বুড়ী ঝি, বললে গাঁয়ের ছোট বড়, মেয়ে পুরুষ, সকলেই বিশ তারিখের জন্য প্রস্তুত হ'চ্ছে। সে বললে :

—কঁস্ত বড় ভালো লোক। তাঁর জন্মদিনটা আমার বেশ মনে আছে—মনে হয় কালকের কথা। তাঁর বাবা, গাঁয়ের প্রত্যেক মেয়ে পুরুষকে উপহার দিলেন; তাঁর মত ভালো লোক আমি জীবনে কখনও দেখিনি। যেদিন তার ছেলে নাম করণ হয় সে দিন তিনি ছেলেটাকে কোলে নিয়ে তাঁর সুন্দরী স্ত্রীর পাশে দাড়িয়ে একে একে সকলকে ছেলে দেখালেন—যেন রাজার ছেলে হ'য়েছে এমনি সকলের আনন্দ! ওঃ সে কি জয়ধ্বনি! আজ সে বিশ বছরেরও বেশী দিনের কথা হ'য়ে গেল। দু বছর পরে কঁস্ত যুদ্ধে মারা গেলেন; সারা গাঁ খানা তাঁর মৃত্যুতে শোকাপ্লুত হ'য়ে পড়লো, তার কারণ সকলে তাঁকে বাপের মত দেখতো। বয়েস তার হ'য়েছিল মোটে ২৩, সেই কম বয়েসেই তিনি মারা গেলেন।

কঁস্তেস অসুখে পড়লেন। সকলে ভাবলেন তিনিও মরবেন—কিন্তু তাঁর দুটী শিশুর চিন্তা তাকে বাঁচিয়ে রাখলো। দুনোয়াকে দেখতে ঠিক তার বাপের মত—একই চোখ একই চুল। কিন্তু গাস্তঁ পেয়েছে তার বাপের স্বভাব—সদাই প্রফুল্ল। ভগবান তাদের রক্ষা করুন—এই আমার ও এই গাঁয়ের প্রার্থনা।

থেরেসের বয়েস প্রায় ৭০। সে আমায় মনে করে কচি খুকী, কারণ সে আমার মায়ের ধাই মা—তার পুরানো কাহিনী আমার মনকে স্বপ্নময় করে তুলতো। কঁস্তের জন্ম দিনে সকলে যে এত আনন্দ করেছিলো তাতে কোন সন্দেহই ছিলোনা।

৬ই নভেম্বর

আমার দিদিমা পারীতে থাকতেন। তিনি আমায় একটা জরি বসান সুন্দর পোষাক পাঠিয়েছেন। সঙ্গে এই চিঠি :

"তোর বাপের কাছ থেকে তোর খবর পেলাম। তার চিঠি খুলে দেখতে পেলাম একটী অতি সুন্দরী মেয়ের ছবি—এরকম সুন্দরী মেয়ে দেখেছি বলে মনে হয় না। তোকে চার বছর দেখিনি, তবু ছবি দেখবামাত্র তোকে চিনতে পারলাম। তোকে দেখতে বড় ইচ্ছে করে কিন্তু আমি বুড়ী হ'য়ে গেছি—রেলে করে যাওয়ার কথা মনে হলে ভয় করে। যদি তোর বাপের সঙ্গে পারীতে আসিস তোর বুড়ী পিসীর কথা ভুলিসনে।"

—জেনেভিয়েভ হেনো দারভ্যার

আমরা গেলাম গোসেরেলদের বাড়ী। মাদমোয়াজেল ইউফোনি আমায় তার ঘরে নিয়ে গেলেন এবং তিনি আমায় কয়েকখানি গহনা দেখালেন—পারী থেকে গহনাগুলি এসেছে। একটা "আকাজু"র ছোট টেবিলের উপর একটী যুবকের ছবি—যুবকের মুখ যেন বিষাদ ভরা।

—এ ছেলেটী কে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—ও আমার ভাগ্‌নে—সঙ্গে সঙ্গে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললে, সে আমার কাঁধের উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে বললে :

—ও আমায় ভালোবাসতো। অষ্ট্রেলিয়ায় যক্ষ্মা হ'য়ে মারা যায়। হায়রে হতভাগ্য! তাকে আমি বিয়ে করতে চাইনি কারণ তার একটী পয়সাও ছিল না। তারপর আমার পাশে তাকে ছোট ভাইয়ের মত দেখাতো। সত্যি! পরস্পরের জন্যে আমরা তৈরী হইনি।

সে আমায় তার মা ও বাবার ছবি দেখালো। এদের ইতিহাস শুনে আমার মন দুঃখে ভরে গেল। এদের সঙ্গে দেখা করার পর আমরা নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম।

লুই-এর একখানা চিঠি বাবার জন্যে অপেক্ষা করছিল। তিনি চিঠিখানি পকেটে রাখলেন। আমি বললাম :

—পড় না বাবা চিঠিখানা। আগেকার মত লুই-এর চিঠি কেন তুমি আর আমাদের পড়ে শোনাও না ?

—তার কারণ তার চিঠিতে অনেক কিছু থাকে যা' তোর জানার মত নয়। এই কথা বলে তিনি আমায় আদর করলেন।

—লুইয়ের আবার কি কথা থাকতে পারে যা' আমার জানবার মত নয়! তার মত সরল লোক তো বড় একটা দেখা যায় না।

—যখন সে এখানে আসবে তখন একদিন সে তার গোপন কথা নিজেই তোকে বলবে। বাবা এই কথা বলতে বলতে, হাসতে হাসতে আমার গালে চুম্বন দিলেন। যা, দেরী হ'য়ে গেছে—খাওয়া দাওয়ার পর একটু বিশ্রাম করে নিস।

—খেতে বসে বাবা বললেন লুই শীঘ্রই আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসবে। তিনি এখানে এসে পৌঁছুবেন ১৮ তারিখে।

—ঠিক উৎসবের আগের দিন,—আমি বললাম।

—কি উৎসব ?—ওঃ মনে পড়েছে তুনোয়ার জন্মোৎসব।

লুইয়ের সঙ্গে আবার দেখা হ'বে শুনে মার খুব আনন্দ হ'ল। আনন্দ আমারও বড় কম হয়নি।

৭ই নভেম্বর

কয়েকদিন হ'ল কঁস্ত আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেননি। তাঁর কোন অসুখ হোলো না' তো! তা হ'লে আমরা নিশ্চয়

খবর পেতাম। আজ দিনটা বেশ ভালো নয়। বাবা এবং আমি, আমরা দুজনে ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গেলাম। আমি বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম তার মৃত কঁন্তের কথা মনে আছে কি না?

—না আমি তাকে দেখিনি।

আমরা পাহাড়ের উপর উঠলাম।

—ঐ দেখ মারগেরীৎ প্রাসাদের সাজায় কে যেন দাঁড়িয়ে রয়েছে না?

আমি চেয়ে দেখলাম, কিন্তু কাউকে দেখতে পেলাম না।

—না বাবা চোখে আমার সূর্যি লাগছে। আমরা ঘোড়ার মুখ ঘোরালাম।

১০ই নভেম্বর

আজ রবিবার। সকলে গির্জায় গেলাম—সকালে ও বিকেলে দুবেলাই। বেরুবার সময় কঁন্তের সঙ্গে দেখা হ'লো। তাঁকে দেখে আমার খুব আনন্দ হ'লো কারণ আমার ভয় হয়েছিল তাঁর অসুখ করেছে। তিনি আমাদের সকলকে নমস্কার করে আমার পাশে পাশে চলতে লাগলেন। তাঁকে একটু রক্তহীন বলে মনে হ'লো—তিনি যেন কি চিন্তা করছিলেন। অসুখ করেছে কি না জিজ্ঞেস করলাম।

—না অসুখ ঠিক নয়, তিনি হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন—গেল সপ্তাহে ভীষণ মাথা ব্যথায় ভুগেছি। তুমি ১৬ তারিখে আসছো তো? দেখো ভুলে যেওনা যেন।

তিনি সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাড়ী পর্যন্ত এলেন

১৬ ই নভেম্বর

আজ সকালে ১০টার সময় কঁন্ত আমায় নিতে এলেন। তাঁকে দেখে মনে হলো তাঁর আর কোন অসুখ নেই। তিনি আমাদের বললেন

আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার পর থেকেই তাঁর শরীর ভালো হতে আরম্ভ হয়েছে। তাঁর ভাইও সঙ্গে এসে ছিল। তাঁরা বললেন মামা এসে গেছেন। তাঁদের সঙ্গে যেতে যেতে বেশী কথা কইলাম না, কারণ তাঁর গলার স্বর আমার বড় ভালো লাগছিল। আমার ভালো লাগবার মত নানা কথা তিনি কইতে লাগলেন। প্রাসাদে কঁতেস আমায় আলিঙ্গন দ্বারা অভ্যর্থনা করলেন এবং কঁত আমার করমর্দন করলেন। ঘরগুলো ফুলে ফুলে ভরা—মালা, নানা রকমারি পাতা আরো কত কি। সঙ্গে সঙ্গে আমি সাজাতে সুরু করলেম, কিন্তু কঁত ও তার মা আমায় ঘর সাজাতে দিলেন না।

দুনোয়া বললে তোমায় জিরোতে হবে মাদময়াজেল দারভ্যার।

এক ঘণ্টা বাদে আমরা কাজ আরম্ভ করলাম। আমার উপর ভার পড়লো মৃত কঁতের চারটে ছবি সাজাবার; কঁতেসের, কঁতের ও তার ভাইয়ের ছবি। প্রথম দুটী ছবির চারদিক সাজিয়ে দিলাম নানা ফুলের মালায়, এবং সেই দুটী ছবিকে সংযুক্ত করে দিলাম কমলালেবু ফুলের শিকল দিয়ে। সাদা ও লাল গোলাপ ফুলের মালায় কঁত ও তার ভাইয়ের ছবি দুটী সাজিয়ে দিলাম। কঁতেস ছবি চারখানি দেখছিলেন। কলোনের অনেকক্ষণ কঁতের ছবির পানে চেয়ে থেকে বললেন কঁতের চেহারা অনেকটা তার বাপের মত।

হ্যা, কঁতেস বললেন, মিল আছে বটে, কিন্তু গরমিলও রয়েছে। চোখের দিকে চেয়ে দেখ, আমার আশিল-এর চোখ দুনোয়ার চোখের চে' সুন্দর। আমার মনে হয় দুনোয়ার চোখ একটু বেশী গভীর আর বিষাদময়। দুনোয়ার চিবুক দেখলে মনে হয় সে যেন একটু একগুঁয়ে।

পরলোকগত কন্তের ছবির নিচে লেখা রয়েছে "আশিল দুনোয়া দে প্ল্যুয়ারভ্যাঁ, বাইশ বছর বয়স"। অন্য ছবির নিচে লেখা রয়েছে "দুনোয়া শার্ল দে প্ল্যুয়ারভ্যাঁ" বয়স কুড়ি বছর।

ভাই বোনে যখন ছবি সম্বন্ধে তাদের মতামত বলছিলেন তখন কঁন্ত ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর মা হাসতে হাসতে বললেন:

দুনোয়া আমরা তোর বদনাম করছিলাম।

—তোমাদের বদনাম করাতে আমার ভারি বয়েই গেল,—কন্ত হাসতে হাসতে উত্তর দিলেন।

কতকগুলি চাষা একটা পাতায় ও ফুলে ভরা তোরণ নিয়ে হাজির হ'লো। সেই তোরণের উপর লেখা ছিল 'তোমার জন্মদিনে আমাদের শুভেচ্ছা নাও, ভগবান তোমায় রক্ষা করুন'। গাঁয়ের লোক যে কঁন্তকে ভালোবাসে এই তার নিদর্শন। কঁন্ত নিজে তাদের ধন্যবাদ দিলেন। বসবার ঘরটা আমরা সাজিয়ে ফেললাম—খাবার ঘর ও আর দুটী ঘরও সাজানো হ'লো। জ্যানেতের সঙ্গে এক মুহূর্ত দেখা হ'য়েছিল। তাকে দেখে মনে হ'লো সে খুব সুখী। সে আমার সঙ্গে বেশী কথা কইতে পারলনা, কারণ সে বললে "ভয়ানক কাজের চাপ পড়েছে মাদময়াজেল"। বিকেলে কঁন্ত ও তাঁর মামা আমায় বাড়ী পৌছে দিলেন। আকাশে চমৎকার চাঁদের আলো। মা'কে সাহায্য করার জন্যে কঁন্ত আমায় বহু ধন্যবাদ দিলেন। ছোট ছোট ঝোপগুলির উপর চাঁদের আলো পড়ে মনে হ'চ্ছিল যেন কে তাদের চকচকে একটা উষ্ণীষে ঢাকা দিয়ে দিয়েছে। আমরা ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছিলাম: আকাশে একটী তারা নেই, কেবল চাঁদের আলোয় চারিদিক ভরা। ছোট নদীর ধার দিয়ে আমরা চলছিলাম। নদীর জলটা মনে হচ্ছিল যেন একখানি আর্শি। নদীর তীরের গাছগুলো নদীর উপর ঝুঁকে পড়েছে, যেন

জলের উপর তাদের প্রতিমূর্তি দেখবার জন্যে। গাছের পাতার ভিতর দিয়ে হাওয়া গুঞ্জন করে চলেছে। কী সুন্দর! আমরা চল্‌ছিলাম, কা'রো মুখে কথা নেই। আমাদের বাড়ীর দরজা পর্যন্ত এসে কঁস্ত ও তাঁর মামা আমার করমর্দন করে বিদায় নিলেন।

১৮ই নভেম্বর

আজ সকালে লুই এসেছেন। আমি ও আমার বাবা ঘোড়ায় চড়ে বেড়াতে গেসলাম। ফিরবার সময় দেখালম একটী ভদ্রলোক আমাদের দরজার কাছে ঘোড়া থেকে নামলেন।

—আরে! আমার বাবা চিৎকার করলেন—লুই যে! আমর' ঘোড়া ছুটালাম। লুই আমাদের সামনে এলেন; বাবা ঘোড়া থেকে নেমে আমাদের বন্ধুকে আলিঙ্গন করে বললেন:

—এস এস, সাদরে অভ্যর্থনা করছি তোমায়।

লুই আমার করমর্দন করলে।

—আমি জানতাম না যে তুমি ঘোড়ায় চড়তে জানো, লুই বললেন।

—এইতো কয়েক সপ্তাহ শিখলাম।

—কিন্তু ও খুব ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারে—বাবা বললেন, আমার গালে টোকা মেরে।

—তা দেখলেই বোঝা যায়, লুই অস্ত্রেলিজকে আদর করতে করতে বললেন।

—ভারী চমৎকার দোআঁসলা ঘোড়া। আমরা বাড়ীতে ঢুকলাম, মা এসে যোগ দিলেন বসবার ঘরে। তিনি লুইকে আলিঙ্গন করতে করতে বললেন:

—তোকে দেখে আমার ভারী আনন্দ হ'লো বাছা। বাবা লুইকে তার ঘরে নিয়ে গেলেন—আগে থাকতেই তার ঘর ঠিক করে রাখা

হ'য়ে ছিলো ; আমি আমার ঘরে উঠলাম। খেতে বসে মা লুইকে কঁস্তেসের নিমন্ত্রণপত্র দিয়ে বল্লেন, "আমাদের সঙ্গ পেলে তিনি ভারী আনন্দিত হ'বেন।" আজ বিকেলে কঁস্ত এলেন। তিনি লুইকে অনুরোধ করলেন আসবার জন্যে, লুই রাজী হ'লেন।

১৭এ নভেম্বর

বাবা আমি ও লুই মাঠের উপর বেড়াতে গেলাম। আমরা ৮টার সময় বেরিয়ে ১১টার সময় বাড়ী ফিরলাম। খাবার আগে আমি একলা ঘরে বসে ছিলাম ; আমার কানে এলো একটী পুরুষের গলার

সুর, বিখ্যাত কবি মুসের গান গাইছেন :

কারে আমি ভালোবাসি
জানিবারে চাই বার বার।
রাজ্য যদি পাই তবু বলিবনা
রহিবে সে হৃদয়ে আমার॥

গান থেমে গেল—লুই বাগানে এলেন, আমিও নামলাম বাগানে।

—মঃ লেফাব্র আপনি যে গান গাইতে জানেন তা আমায় বলেন নি তো!

—একে কি গান গাওয়া বলে না কি? তিনি আশ্চর্যের ভান করে বললেন।

—নিশ্চয়।

—সত্যি?

খাবার জন্যে আমারা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলাম।

কাল উৎসব।

২০এ নভেম্বর

আজকের দিন কী আনন্দের হ'বে! লুই বাবাকে জিজ্ঞাসা করলেন ইউনিফরম পরে প্রাসাদে যেতে হ'বে কি না।

—নিশ্চয়, তুমি যে সৈনিক। আমার মত যখন অবসর নেবে তখন যা' খুশী তাই কোরো।

প্রাতভোজনের পর আমরা ভোর বেলা বেরিয়ে পড়লাম। আমাদের ইচ্ছে ছিল গাঁয়ের চাষাদের খেলা-ধুলার সময় উপস্থিত থাকি। মাঠের উপর তাদের খাওয়ান হ'বে। এই খানেই আমার ডাইরী আজ বন্ধ করতে হ'লো।

২১ এ নভেম্বর

কালকের দিন আমাদের খুব আমোদে কাটলো। যখন আমরা গিয়ে পৌঁছালাম তখন চাষীদের খেলা আরম্ভ হ'য়ে গেছে। লুইকে দেখে কঁস্তেসের খুব আনন্দ হ'লো। গোসেরেল-রাও সেখানে ছিলেন আশপাশের সকলেই এসে ছিল। আমরা ঘরে ঘরে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দুপুরে গাঁয়ের লোকদের জন্যে টেবিল সাজানো হ'লো। আমরা সকলে উঠানে এসে বসলাম। নিমন্ত্রিতেরা দলে দলে বসলেন। কঁস্ত আমায় সঙ্গে নিয়ে চাষীদের মধ্যে ঘুরে বেড়ালেন। একজন বুড়ো ব্রীটন টুপিতে হাত দিয়ে বললো:

—ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করুন। আমি বললাম:

—ভগবান তোমার আশীর্বাদ করুন। তার কঠিন ঠোঁটের চমৎকার হাসি, ও তার শ্বেন চক্ষুর নম্র ভাব আমার ভারী ভালো লাগলো। তার মাথায় টুপি ছিলনা 'হাওয়া তার কোঁকড়া চুল দুলিয়ে বয়ে যাচ্ছিল' মাঝে মাঝে তার হাতির দাঁতের মত সাদা কপাল বার হয়ে পড়ছিল। তাকে ভাল না বেশে থাকা যায় না।

আমি খুব কম কথা কইছিলাম। তার আনন্দ পূর্ণ গলার স্বর শুনতে আমার ভারী ভালো লেগেছিল। তিনি প্রত্যেকের সঙ্গে কথা কইছিলেন এবং তাদের সমস্ত খুঁটিনাটি মন দিয়ে শুনছিলেন। আমরা কঁন্তেসের কাছে ফিরে এলাম।

—জুনোয়া, তোর কি দুঃসাহস বলতো! এই কাঠফাটা রোদ আর তোর মাথায় টুপি নেই, মাথা ধরবে যে!

তিনি আমাকে তার পায়ের কাছে বসিয়ে আমার মাথার চুলের ভিতর আঙ্গুল দিয়ে আদর করতে লাগলেন। কঁন্ত আমার কাছে বসলেন। আমি কঁন্তসের হাঁটুর উপর মাথা রেখে বসেছিলাম।

—সকলেই আনন্দ করছে, নয় জুনোয়া?

—হ্যা মা

—কটা বাজলো?

—প্রায় তিনটে মা মণি।

কী তাড়াতাড়ি সময় যাচ্ছে।

প্রায় অর্ধঘণ্টা বসেছিলাম। কঁন্তেস বললেন।

—তোর কি হ'লো রে? কি ভাবছিলি?

—কিছু না, স্বপ্নোত্থিতার মত বললাম।

—প্রায় পনের মিনিট তুই তো মুখ খুলিসনি—তিনি হাসতে হাসতে বললেন।

মাদমোয়াজেল গোসেরেল আমাদের কাছে এলেন। কঁন্তেস উঠলেন, আমরা মা'র কাছে গেলাম। আমরা ৫টা পর্যন্ত বাইরে রইলাম। সান্ধ্য ভোজনের পূর্বে সকলে একটু বিশ্রাম করতে গেলাম। নীচের ঘরের ছবিগুলো সকলে দেখছিল। সাজানো'র সুখ্যাত সকলে খুব

করলে। আমি একটু দল ছাড়া হয়ে শার্শির কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখতে লাগলাম। আমার সারা শরীরে যেন একটা সুখকর শান্তির ভাব; বড় একলা থাকতে ইচ্ছে করছিল। মাদমোয়াজেল গোসেরেল এলেন আমার চমক ভাঙ্গাতে।

—তুমি এই সৈনিকটিকে চেন? জিজ্ঞাসা করলে লুইকে দেখিয়ে।

—নিশ্চয় নিশ্চয়,—আমি হাসতে হাসতে উত্তর দিলাম, উনি তো কাপিত্যাঁন লেফ্যাব্র

—উনি তোমার আত্মীয়ের মধ্যে নাকি?

—না একজন পুরানো বন্ধু।

লুই আমার কাছে এলেন। আমি তাকে মাদমোয়াজেল গোসে-রেলের সঙ্গে পরিচয় করে দিলাম। মাদমোয়াজেল গোসেরেল তাকে নিয়ে পড়লেন। কত কি যে জিজ্ঞাসা করলেন তা আমি বলতে পারি না। খাওয়া দাওয়ার পর বাজি পোড়ানো হ'লো। প্রাসাদে নাচের চলন ছিলনা; আমার তা ভালই বোধ হ'লো। স্বামীর মৃত্যুর পর থেকে বল নাচের চলন কঁন্তেস তুলে দিয়েছিলেন। মাদমোয়াজের গোসে-রেল কিন্তু সেজন্যে বেশ একটু দমে গেলেন।

—ভালস্ বা কাদ্রিই-এ কি আর আনন্দ হয়, তিনি বল্লেন।

—ওটা রুচির উপর নির্ভর করে, নিজের নিজের রুচি সকলেরই আছে—আমি উত্তর দিলাম।

—তা হ'লে তুমি কি নাচ পছন্দ কর না?

—খুব বেশী না

—তুমি তো এখনো কচি খুকী।

এই কথা বলে তিনি মারকি দে সেরেই'র সঙ্গে বেড়াতে চলে গেলেন।

রাত এগারটা পর্যন্ত আমোদ-প্রমোদ করে আমরা ঘরে ফিরলাম। কী দিন! চাষীদের কঁন্ত দীর্ঘায়ু হ'ন, প্রজাবন্ধু দীর্ঘায়ু হ'ন' চিৎকার আর থামেনা। রাত্রে, কালো কালো দলে, চাষীদের দেখতে ভারী সুন্দর লাগছিল—সকলে টুপি নাড়তে নাড়তে আনন্দে জয়ধ্বনি করতে করতে চলে যাচ্ছিল। কঁন্ত প্রাসাদের দরজা পর্যন্ত আমাদের পৌছে দিলেন। তার লোমেভরা ওভার কোটটা আমার গায়ে ঢাকা দিয়ে দিয়েছিলেন।

—দেখ যেন ঠাণ্ডা লাগেনা—বেশ শীত পড়েছে, তিনি আমায় বললেন।

কঁন্তেস তার অভ্যাস মত আমায় আলিঙ্গন করলেন। পরস্পর পরস্পরকে নমস্কার করে এবং করমর্দন করে গাড়ীতে উঠলাম—গাড়ীর চালক ঘোড়ার পিঠে চাবুক মারলো—আমরা চলে গেলাম।

আমর সকলে ভাল আছি কি না তা'র খোঁজ নিতে কঁন্ত আজ এলেন। তিনি, লুই, বাবা এবং আমি, আজ ঘোড়ায় চড়ে অনেক দূর বেড়িয়ে এলাম। কী দ্রুতবেগে আজ আমরা ঘোড়া ছুটিয়ে ছিলাম। গির্জার ঘড়িতে ১১টা বাজলো। আজ এই খানেই শেষ করতে হ'বে আমার লেখা।

২২শে নভেম্বর

আজ সকালে আমরা ঘোড়ায় চড়ে বেড়িয়েছি। মাদমোয়াজেল গোসেরেল ও তার মা'র সঙ্গে আমাদের দেখা হ'য়েছিল। তারা গাড়ী করে, কাছাকাছি কোন এক মার্কির সঙ্গে দেখা করতে চলেছিলেন। মাদমোয়াজেল গোসেরেল আমায় বললে শীঘ্র একদিন তার মা'র সঙ্গে দেখা করতে। সে লুইকেও নিমন্ত্রণ করলো—লুই যেতে চাইছিল না।

যেতে পারলে তো আনন্দ হ'তো কিন্তু আমার একটু সময় নেই··· আর ·· ···

—আপনার বন্ধুদের সঙ্গে "এইটুকু" সময় কাটাতে চান, নয়? কি বলুন? হাসতে হাসতে মাদমোয়াজেল গোসেরেল বললেন। আগেই আমার সে সন্দেহ হ'য়েছে. আপনি এখন বন্দি হ'য়ে পড়েছেন নয়?

এ কথাটা লুই বেশ ভালো ভাবে নিলেন বলে মনে হ'লোনা। তাঁর ভ্রূযুগল একটু কুঞ্চিত হ'য়ে উঠল; তিনি আমার দিকে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলেন। মাদমোয়াজেল গোসেরেল বুঝতে পারলে যে লুই অসন্তুষ্ট হ'য়েছেন, সে আবার বললে

—তা হ'লে আপনি আসছেন তো? মারগেরীৎ, ওঁকে সঙ্গে নিয়ে এসো।

—কিন্তু উনি যদি না আসতে চান—আমি বল্‌লাম লুইএর পানে চেয়ে। তাকে আমি কখন রাগ করতে দেখিনি।

—দেখুন, ভালোমানুষ সাজবেন না, মাদমোয়াজেল গোসেরেল হাস্‌তে হাস্‌তে বললেন, তার পর মিষ্টি হেসে বললেন:

—যদি উনি না আসেন, তা হ'লে তুমিই একলা এসো ভাই তিনি হেসে বিদায় নিলেন। লুই এগিয়ে গেলেন, আমি এবং বাবা একটু জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে তাকে ধরে ফেললাম।

বাবাকে ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করলাম

—লুই রাগ করলেন না কি?

—না, আমার মনে হয় না।

—তবে মাদমোয়াজেল গোসেরেলের সঙ্গে কথা কইতে কইতে উনি ভ্রূ-কুঞ্চিত করলেন কেন? আর দেখনা এখনও মুখ দেখলে মনে

হয় যেন কি চিন্তা করছেন। বাবা হাসতে হাসতে ডাকলেন "লুই—"

—লুই ঘোড়ার মুখ ফেরালেন। তার মুখ আনন্দোৎফুল্ল।

—কি বলছেন ?

—মারগেরীতের ধারণা, তোমার রাগ হ'য়েছে। সত্যি ?

—সত্যি একটু রাগ হয়েছিল ; এ গোসেরেল মেয়েটা যেন একটু নির্লজ্জ।

বিকেলে আমরা সকলে বাগানে বসেছিলাম। খুকী হেলেন কাঁদতে কাঁদতে দৌড়ে এলো। তাকে হাঁটুর উপর বসিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম :

—কি হ'লো !

—পীয়্যার-এর ভীষণ অসুখ। তাকে ভালো করে দেবে এসো।

আমি তাকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করলাম। মা তা'কে বড এক টুকরো কেক দিলেন। সকলে আমরা চললাম তার বাবার ছোট্ট বাড়ীটীর দিকে। মাটির ত'লার ঘরে কেউ ছিলনা।

—সকলে শোবার ঘরে, হেলেন চুপি চুপি আমায় বল্‌লো।

আমি উপরে উঠে দরজায় ধাক্কা দিলাম। কোন উত্তর নেই, আবার ধাক্কা দিলাম, সব চুপ চাপ। তার পর দরজা খুলে ভিতরে প্রবেশ করলাম। ঘরের ভিতর অগ্নিকুণ্ডের কাছে মা' ছেলেকে কোলে করে নিয়ে বসেছিলেন। মঁঃ ভালপয়েন জানলার কাছে ছিলেন, তাঁর স্ত্রী এবং তার শিশু পুত্রের পানে শঙ্কিত ভাবে চেয়ে ছিলেন। ক্লদ তার বাবার হাঁটুর উপর মাথা রেখে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখতে পেয়ে মঁঃ ভালপয়েন এগিয়ে এলেন।

—আপনি বড় ভালো, মাদমোয়াজেল তিনি খাটো গলায় বললেন —ছেলেটার ভীষণ অসুখ করেছে ; মা'র কষ্টের সীমা নেই।

আমি মা'র কাছে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হয়ে বসলাম। ছেলেটার মুখ একেবারে রক্তহীন, জীবনের সাড়া নেই, চোখ দুটী বন্ধ। আমি মা'র কোল থেকে তাকে নিতে গেলাম, সে দিল না—না না, আমার কোলেই থাক, বেশীক্ষণ ও থাকবে না।

সে ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠলো।

—হায় ভগবান, কিছু পরেই ওকে মাটীর নীচে স্থান নিতে হ'বে। আমি ভাবলাম।

—ভগবান ওকে রক্ষা করবেন। মা' ছেলেটীকে আমার কোলে দিল। আমি কাঁথা দিয়ে ছেলেটীর হাত পা ভালো করে চাপা দিয়ে দিলাম।

—মঃ ভালপয়েন, ডাক্তার ডাকলে ভালো হয় না? আমি তার বাবাকে জিজ্ঞাসা করলাম।

তিনি তার স্ত্রীর পানে চাইলেন। ডাক্তার এসেছিলেন কিন্তু তিনি আশা ছেড়ে দিয়ে গেছেন। যাই হ'ক আমি মঃ ভালপয়েনকে ডাঃ সাঁন্তোকে ডাকতে পাঠালাম। কয়েক মিনিট পরে শিশু চোখ মেলে চাইলো আবার বন্ধ করলো। হাত পা শক্ত হ'য়ে গেল। আমি ছোট ছেলেদের চিকিৎসা সম্বন্ধে কিছু জানতাম না, তবেমার কাছে শুনেছিলাম দড়কা হ'লে গরম জলের ঝাপ্টা দিলে উপকার হয়। আমি তাকে গরম জলে নাইয়ে দিলাম, আর ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম তাকে ভালো করে দেবার জন্যে। গরম কাপড়ে মুছিয়ে দেবার পর সে চোখ মেলে চাইলো। তার মুখের কাছে এক চামচ দুধ ধরতে সে তা পান করলো। মা চিৎকার করে উঠল।

—পিয়্যার বেঁচে গেছে।

ছেলেটীকে তার ছোট দোলনায় শুইয়ে দিলাম সে ঘুমোতে

লাগলো। মা'কে বললাম একটু জিরিয়ে নিতে, তিনি রাজী হলেন না। আমরা ডাক্তারের জন্য অপেক্ষা করছিলাম। আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম ছেলেটীকে বাঁচিয়ে দেওয়ার জন্যে। সিঁড়িতে শুনতে পেলাম কার পায়ের শব্দ, ঘরের দরজা খুলে ডাক্তার প্রবেশ করলেন, পিছনে মঃ ভালপয়েন। ডাক্তারকে রোগী সম্বন্ধে সবই বলা হলো। মঃ ভালপয়েনের চোখে জল এলো। ডাক্তার আমায় বললেন যেন শিশুর ঘুম ভাঙ্গানো না হয়। তিনি একটী ঔষধ দিয়ে বলে গেলেন ঘুম ভাঙ্গলে শিশুকে খাওয়াতে। চলে যাবার সময় ডাক্তার আমার করমর্দন করলেন। তিনি ছিলেন আমাদের বাড়ীর চিকিৎসক।

—মারগেরীৎ তোমার প্রাণ বড় কোমল।

এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন। ছ'টার সময় লুই ও আমার বাবা আমার খোঁজে এলেন। ছেলেটী তখনও ঘুমোচ্ছে আমি নীচে নামলাম। হেলেন লুইরের হাঁটু ধরে দাঁড়িয়ে ছিল, এবং তাকে বলছিল কেমন করে (পিয়্যার) বেঁচে উঠছে।

—আমি জানতাম যে মাদমোয়াজেল ওকে বাঁচিয়ে তুলবেন—তিনি বড় ভালো।

আমায় দেখতে পেয়ে সে ছুটে এলো। ছেলেটী ভালো আছে শুনে বাবার খুব অনন্দ হয়েছিল, আমি হেলেনকে আদর করতে সে লুইএর কাছে দৌড়ে গেল।

—আপনি আমায় আদর করলেন না।

তিনি হাসলেন। আমরা বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করলাম। আমি ছেলেটীর কাছে গেলাম; সে বেশ সেরে গেছে। ভগবানকে ধন্যবাদ।

২৩ নভেম্বর

আজ বিকালে খাওয়া-দাওয়ার পর আমি ও আমার মা বাইরের ঘরে

বসেছিলাম, চেয়েছিলাম কপিত্যান লুই ও আমার বাবার দিকে, তাঁরা সিগার মুখে করে বাগানে পায়চারি করছিলেন। মনে হচ্ছিল তাঁরা যেন একটা গুরুতর ব্যাপার নিয়ে আলোচনা করছেন। মাকে আমি সে কথা বললাম, তিনি হাসলেন। মা' বললেন :

—মারগেরীৎ ওদের কথা থামাতে হবে, যা ওদের ভেতরে নিয়ে আয়, কফি ঠাণ্ডা হয়ে গেল।

আমি ছুটে গেলাম বাইরে। তাদের কাছে এগিয়ে এসেছি এমন সময় শুনতে পেলাম বাবা বলছেন :

—তোমরা দুজনেরই এখন বয়েস কম, তবে তাকে তুমি একথা জিজ্ঞাসা করতে পারো। যখন কেউ···

বাবার কাঁধের উপর হাত রাখলাম ; তিনি হঠাৎ মুখ ফিরালেন।

—আরে ! তুই ! তিনি অবাক হয়ে বললেন।

আকাশে চমৎকার চাঁদিনী।

—তোমাদের ডাকতে এলাম বাবা। মা কফি নিয়ে বসে আছেন।

বাবা আমার হাত ধরলেন।

—এক পাক ঘুরে, তার পর ঢুকবো···চল !

কপিত্যান সিগার ফেলে দিলেন।

—আরে ! লুই ! তুমি তো ধুম পান করতে পারতে, সিগারের গন্ধে তো মার গেরীৎ কখনও আপত্তি করে না ; ওটা ওর অভ্যাস হয়ে গেছে। ও বোধ হয় মনে করে একজন সৈনিকের সিগার খাওয়া প্রয়োজন···

এই কথা বলে বাবা আমার গালে টোকা দিলেন।

—আপনার তৃষ্ণা পায়নি ? অমি বললাম কাপিত্যানকে। তিনি একটু চিন্তিত ভাবে আমার পাশে পাশে চলছিলেন।

—সিগারের পর সকলেরই তৃষ্ণা পায়—তিনি উত্তর দিলেন।

—চল বাবা ভিতরে যাই; মঃ লেফ্যাব্র-এর তৃষ্ণা পেয়েছে, আমারও···

—মারগেরীৎ তুই মঃ লোফ্যাব্র বলছিস কেন বল্‌তো—লুইতো তোকে মাদমোয়াজেল দারভ্যার বলে না।

—না, আপনি আমায় নাম ধরে ডাকেন, নয়?

তিনি হেসে জানালেন যে নাম ধরেই ডাকেন।

—তা হ'লে আমিও আপনাকে লুই বলে ডাকবো। তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিলাম; তিনি আমার হাত ধরলেন।

—চলুন, অনেক কথা কওয়া হ'য়েছে; মা রাগ করবেন। মা কফি দিলেন। প্রথম কাপ আমি আমার বাবাকে দিলাম।

—আগে অতিথিকে দেওয়া উচিত—বাবা হাসতে হাসতে বললেন।

—আমি আরম্ভ করি বয়েস অনুযায়ী; আগে তুমি, তারপর মা তারপর লুই আর আমি।

—মা অবাক হ'য়ে আমার পানে চাইলেন—"লুই"! তারপর তিনি বাবার দিকে চাইলেন। তিনি হাসলেন ও সেই সঙ্গে মাথা নাড়লেন।

—তুমিই তো আমায় শিখিয়েছ বাবা।

—তারপর আমি লুইকে নাম ধরে ডাকার ঘটনাটা সব মাকে বললাম।

—কিন্তু ও-তো তোকে ছোট্ট করে "মারগেরীৎ" বলে ডাকে না—ও-তো বলে মাদমোয়াজেল মারগেরীৎ।

—তা হ'লে আমিও বলবো মঃ লুই।

মা কিছু বলবার আগেই তিনি বললেন :

—না না···কেবল "লুই" বলে ডাকলে আমার ভালো লাগবে।

—তা হ'লে আমায় "মারগেরীৎ" বলে ডাকবেন, মাদমোয়াজেলটা বাদ দিয়ে।

—ম্যা···মা···

···মারগেরীৎ, আমি বাকিটুকু যোগ করে দিলাম। সে ভীষণ লাল হয়ে উঠলেন। মনে হল তিনি আবার মারগেরীৎ বলতে যাচ্ছিলেন।

২৪এ নভেম্বর

লুই আজ চলে যাবেন। আমি ভাবছিলাম হয়তো বা আমি তার চলে যাওয়ার কারণ। আজ সকালে যখন একটা তোড়া করবার জন্যে আমি ফুল তুলছিলাম তখন লুই আমার কাছে এলেন। আমার দু'হাতে ফুল ভরা ছিল, সে জন্যে তার দিকে হাত বাড়াতে পারলাম না। আমার অবস্থা দেখে তিনি একটু হাসলেন।

—বেশ চমৎকার একটা ফুলের তোড়া হ'বে মারগেরীৎ—কই তুমি তো আমায় সম্ভাষণ জানালে না।

আমি হাত বাঁড়িয়ে দিলাম।

—ফুলগুলির সুন্দর গন্ধ, নয়? আমি তোড়াটা তার দিকে ধরলাম, তিনি গন্ধ শুঁকলেন।

—আমায় একটা ফুল দাও···দেবে না?

—কিন্তু কি ফুল আপনি ভালোবাসেন? উৎফুল্ল হয়ে বল্‌ল মারগেরীৎ।

—মারগেরীৎ ফুল—সে উত্তর দিলে।

ঠাট্টা করছেন কি না জানবার জন্যে আমি তার মুখের দিকে চাইলাম। মনে হ'লো তিনি রসিকতা করছিলেন না।

—সত্যি ? না আমাকে খোসামোদ করে বলা হচ্ছে। আমি হাসতে হাসতে বললাম।

—সত্যি ! তিনি উত্তর দিলেন, আমি আমার সুন্দরী মারগেরীতকে সকলের চেয়ে ভালোবাসি।

আমি আমার তোড়ার ভিতর খুঁজলাম।

তাইতো ! একটীও মারগেরীৎ নেই, আচ্ছা আমি তুলে আনছি, বাবাও ভালোবাসেন মারগেরীৎ ফুল। আমি চেরী বাগানে গেলাম। সেখান থেকে মারগেরীৎ ফুল তুলে একটা ছোট তোড়া করলাম।

এই নিন এই তোড়াটা আপনার। তাকে একটা তোড়া দিলাম।

—পারীর ছোট মেয়েরা যারতার পিছনে ছুটে বেড়ায় তাদের শুকিয়ে যাওয়া ফুলের তোড়া নিয়ে এবং বলতে থাকে, "আপনাকে ফুটিয়ে তুলুন" যতক্ষণ না তারা ফুলের তোড়া কেনে তারপর নিজেরাই তারা ফুলের তোড়া বসিয়ে দেয়, যে কোন জামার বোতামের ঘরে।

এই কথা বলতে বলতে তিনি চেষ্টা করতে লাগলেন ফুলের তোড়াটা তার জামার বোতামের ঘরে বসিয়ে দিতে।

—পরিয়ে দেব ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম।

—তুমি কত কাজের লোক ! আর আমি একেবারে অকেজো।

আমি যখন ফুলের তোড়াটা বোতামের ঘরে গুঁজে দিচ্ছিলাম, সেই সময় লুই ঘাড় হেঁট করে দেখছিল আমার কাজ। কাজ শেষ করে আমি হাসতে হাসতে মুখ তুলে চাইলাম। দেখলাম তার মুখমণ্ডল চিন্তাযুক্ত। তিনি আমার হাতখানি নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে হঠাৎ নিচু, মিষ্টি গলায় বলে চললেন :

—মারগেরীৎ আমি তোমায় কত ভালোবাসি; হয়তো আমার জীবনের চেয়ে ভালোবাসি; 'কত যে ভালবাসি তা তোমার কাছে প্রকাশ করবার ক্ষমতা আমার নেই। তুমি কি আমার স্ত্রী হ'বে না?

প্রথম ভয়ে ভয়ে আমি তার পানে চাইলাম; তারপর যখন তিনি থামলেন:

—ওঃ লুই, আমি হঠাৎ বললাম,—ও কথা তুমি বলো না, তা সম্ভব নয়।

আমার কাঁদতে ইচ্ছে করছিল; আমি দু'হাতে মুখ ঢাকলাম।

—তুমি কি আমায় ভালোবাসো না, মারগেরীৎ? তিনি ভিজে গলায় বললেন।

—হ্যাঁ, নিশ্চয়, কিন্তু তোমায় ভালবাসি অন্য রকম ভাবে তা তুমি ভাবতেও পার না।

—আমার পানে চাও মারগেরীৎ।

আমি চোখ তুললাম; সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়েছিলো। তার শঙ্কাকুল মুখ একেবারে রক্তহীন।

—তুমি কি আর কাউকে ভালোবাসো?

আমি চুপ করে আছি দেখে সে বিদ্রূপের সুরে বললে!

—হুঃ, আমি পাগলামী করেছিলাম তার সমকক্ষ হবার জন্যে।

এই কথা বলে সে চলে গেল। আমি তার চলার পথের দিকে চেয়ে রইলাম। শুষ্ক পাতাগুলি গাছের শাখা থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে আমাদের পায়ের কাছে পড়ছিল। আমি ছুটে গেলাম তার কাছে। তার হাতের উপর হাত রেখে আমি বল্লাম:

—লুই আমায় ক্ষমা করো! আমার উপর রাগ করো না।

সে সঙ্গে সঙ্গে কোন উত্তর দিল না। কিছু পরে, হয়তো আমার চোখের জল আর রক্তহীন মুখ দেখে তার একটু দয়া হ'লো।

—রাগ কি আমি করতে পারি? সে ধীরে ধীরে বললে।

—তা হ'লে···তুমি দূরে চলে গেলেও আমাদের বন্ধুত্ব অটুট থাকবে? থাকবে তো লুই?

—হ্যাঁ! নিশ্চয় সুখী মারগেরীৎ, যদি তুমি আমায় ভালোবাসতে পারতে, তা হ'লে সুখী হ'তাম।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর সে আবার বল্‌লে :

—বিদায়! মারগেরীৎ

—বিদায়? লুই···

—হ্যাঁ! উপায় নেই! তোমায় দেখবার জন্যে আর আমি ফিরে আসবো না।

আমি তার দিকে আমার হাত বাড়িয়ে দিলাম। সে দৃঢ় ভাবে আমার হাতখানি তা'র হাতের মধ্যে ধরলে। নিজের হাতের মধ্যে আমার হাতখানি কিছুক্ষণ রেখে বল্লে।

—কী সুন্দর হাতখানি!

তার পর হঠাৎ যেন নিজেকে সে আর ধরে রাখতে পারলো না; আমার হাতের উপর একটা উত্তপ্ত চুম্বন দিলে। পরক্ষণেই দেখলাম সে বাড়ীর মধ্যে প্রবেশ করলে। কয়েক মিনিট পরে আমিও প্রবেশ করলাম। নিজের ঘরে গেলাম, এবং নতজানু হ'য়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম,—যেন লুইকে তিনি সুখী করেন, এবং আমায় যেন তিনি ক্ষমা করেন। আমি কাঁদতে লাগলাম··· তারপর উঠে জানলার কাছে এসে বসলাম। দেখলাম আমাদের

বুড়ো চাকর আস্তাবলে প্রবেশ করলো। সে আস্তাবল থেকে বা'র হ'লো লুইয়ের ঘোড়ার লাগাম ধরে। তা হ'লে লুই চলে যাচ্ছে। শীঘ্রই দেখতে পেলাম লুই বাড়ী থেকে বার হ'লো, আমার বাবা তার করমর্দন করলেন। মাও তার করমর্দন করলেন। তারপর লুই তাঁদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে ঘোড়ায় উঠল। বাবা আবার তার করমর্দন করলেন, মা তাকে চুম্বন করলেন। তারপর সে চলে গেলেন। আমি দেখতে লাগলাম সে দূরে চলে যাচ্ছে। অভ্যাসমত সে ফিরেও চাইল না, তার টুপিও আন্দোলিত করলে না। মা যখন ঘরের ভিতরে এলেন আমি তখনও জানলার কাছে বসে। তিনি সব শুনেছেন। তিনি শোফার উপরে আমার কাছে বসলেন, আমি তাঁর বুকের উপরে মাথা রাখলাম।

—মারগেরীৎ তুই কি লুইকে ভালোবাসিস না ?

—ভালোবাসলেও সে যে রকম ভালোবাসা চায় সে রকম ভালো আমি তা'কে বাসি না।

—তুই কি আর কাউকে ভালোবাসিস ?

—হ্যাঁ...মা।

আমি হেসে উঠলাম, কারণ তখন আমি চিন্তা করছিলাম সুদৃঢ় এবং কঠিন অধরের হাসির কথা, দুটী কালো কালো ঈগল পাখির মত চোখের কথা, হাতীর দাঁতের মত সাদা সুউন্নত কপালের উপর খসে পড়া কুঞ্চিত কালো কেশের কথা।

—হতভাগ্য লুই! আমার মা বললেন। আমাদের ইচ্ছে ছিল তাকে জামাই করবার। যা'ক, ভগবান যা করবেন তা আমাদের ভালোর জন্যেই।

—কাঁদিসনে বাছা, চোখে জল দিগে, একেবারে লাল হ'য়ে উঠেছে

চোখ দুটো। আমায় আলিঙ্গন করে তিনি বেরিয়ে গেলেন। মা আমার কত স্নেহময়ী, আমায় একটু বকলেনও না। হায়রে নিষ্ঠুর হৃদয়! যে তোকে চায় না তার হাতে কেন নিজেকে সঁপে দিস্? বাবা এমন কোন কথাই আমায় বল্লেন না যা' আমায় আঘাত করতে পারে। তিনি কেবল চিন্তিত হ'য়ে ছিলেন। বিকেল বেলা যখন সকলে অগ্নিকুণ্ডের চার দিকে বসে ছিলেন, তিনি আমার কাঁধের উপর হাত রেখে অনেকক্ষণ আগুনের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

রাত্রে আমার ঘরের ভিতর জানলার কাছে, অনেকক্ষণ বসে রইলাম—কুয়াসায় ভরা মাঠের দিকে চেয়ে। কে যেন ঘরে প্রবেশ করলো। চেয়ে দেখলাম থেরেস; সে আগুনটা একটু বাড়িয়ে দিয়ে আমার কাছে এসে বসলো।

—কাপিত্যান চলে গেল কেন রে? আহা কী সুন্দর দেখতে।

—তার ইচ্ছে গেল তাই।

—না, মা, তা নয়, তোমার দুটী সুন্দর চোখের জন্যেই তিনি চলে গেল। আমি উত্তর না দেওয়াতে সে আবার বললো:

—শোন! আমায় থামিও না। যখনই তার দৃষ্টি তোমার পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতে দেখলাম তখনই আমার সন্দেহ হ'য়েছিলো, এর মানে কিছু একটা আছে। আর তুমি কিছুই বুঝতে পারলে না! আজ সকালে সিঁড়ি ঝাঁট দিচ্ছিলাম তাকে দেখতে পেলাম, সর্বশরীর তার যেন অগোছালো, টুপিটা চোখের উপর পর্যন্ত নেমে পড়েছে। তিনি তার ঘরে ঢুকে দরজায় খিল দিলেন। আমি অবাক হ'য়ে গেলাম। শুনতে পেলাম ঘরের ভিতর তিনি কাঁদছেন। দেখছো তো মা তিনি তোমায় কত ভালোবাসেন। মিনিট পনের পরে তিনি ঘর থেকে বা'র হ'লেন, হাতে তার রাত্রের ব্যাগ।

তিনি আমায় দেখতে পেয়ে বললেন, "বিদায় থেরেস"—তার মুখে বিষাদের হাসি ফুটে উঠলো আমি স্পষ্ট দেখতে পেলাম ; তা হ'লে আপনি কি চলে যা'চ্ছেন ? আমি জিজ্ঞাসা করলাম। "হ্যাঁ থেরেস, আমি চলে যাচ্ছি—বিদায়"—এই কথা বলে তিনি নিচে নামলেম এবং তোমার বাবার পড়বার ঘরে প্রবেশ করলেন।

সে থামলো ; আমি জানলার উপর কনুই রেখে হাত দিয়ে মুখ ঢেকে বসেছিলাম। হতভাগ্য লুই ! একটা হাত আমার জামার হাতা ধরে টানলে।

—তুমি তো আমার উপর রাগ করনি মা ? থেরেস বললে।

—না। থেরেস।

তারপর সে আদরের স্বরে বললে।

—তাকে চিঠি লেখো না মা ; তাকে ফিরে আসতে বলো। তোমার হাতের লেখা দেখলে সে ফিরে না এসে থাকতে পারবে না ! তাকে সুখী করো ! লিখবে তো মা তাকে ?

—না থেরেস, তাকে লেখা সম্ভব নয়।

সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে।

—কিন্তু তোমার অভাবে সে অসুখী হবে ! তোমার প্রতি তার ভালোবাসাই হয়তো তার মৃত্যুর কারণ হবে।

ও কথা বলিসনি থেরেস, ও কথা বলতে নেই। আমি বললাম। আমার চোখে অশ্রু ভরে উঠলো।

ভগবান তাকে মরতে দেবেন না থেরেস ; তিনি যে আকাশে থেকে আমাদের দেখছেন, তিনি যে আমাদের ভাবনাই ভাবছেন ! তিনি তো আমাদের মঙ্গলের জন্যই আছেন।

তুমি যা করো সবই ভালোর জন্য করো মা। স্বর্গের দেবীরা তোমায় রক্ষা করবেন— সে বেরিয়ে গেল।

হাওয়া ক্রমশ শীতল হচ্ছিলো, তারাগুলো জ্যোতিহারা; আমি জানলা বন্ধ করে দিলাম। সৌভাগ্যকে কি আমি হেলায় হারালাম ?···না নিশ্চয়ই না। কি করে আমি তার সঙ্গে সুখী হতাম ? তাকে তো আমি সে-রকম ভালোবাসতে পারিনি। আমি তাকে ভালোবাসি বন্ধুর মত, সত্যিকারের বন্ধুর মত। আমার মনে হ'লো যা আমি করেছি তা আমার করা উচিত ছিল। আবার জানলা খুলে দিলাম। বরফের মত শীতল হাওয়া ঘরে প্রবেশ করলো, মনে হ'লো যেন আমার হাড়ের ভিতর পর্যন্ত প্রবেশ করছে সে হাওয়া। কোন অজানা বেদনার আভাসে আমার সারা শরীর শিউরে উঠলো। আমি জানলা বন্ধ করে দিলাম। আবার ক্রোয়ার কাছে নতজানু হলাম। "ভগবান! আমাদের চিব সাথী হয়ে থেকো"। অনেকক্ষণ আমি নতজানু হয়ে বসে রইলাম; চিন্তা করতে লাগলাম সমস্ত ঘটনা। আমাদের সকলের জন্যে, লুই-এর জন্যে এবং আমি যাকে ভালোবাসি তার জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম। ঘড়িতে রাত বারোটা বাজলো! এবার শুয়ে পড়া দরকার।

২৭ এ নভেম্বর

কাল বিকেলে বসবার ঘরের জানলার কাছে বসে কি যে ভাবছিলাম তা জানি না। দেখলাম কঁত্ত যাচ্ছেন। তিনি কি আমাদের বাড়ী ঢুকবেন না ? সিঁড়িতে পায়ের আওয়াজ শুনতে পেলাম। ঠিক সেই সময়ে বাবা তাঁকে সঙ্গে নিয়ে ঘরে প্রবেশ করলেন। ঘরে আলো ছিল না। অগ্নিকুণ্ডের আলোয় ঘরখানা আলোকিত হয়ে ছিল।

বাবা ঘণ্টা বাজালেন বুড়ো আদল্‌ফ বাতি নিয়ে ঘরে ঢুকলো। কঁন্ত আমার করমর্দন করলেন।

—তোমায় দেখে মনে হচ্ছে যেন একটু রক্তহীন, মাদমোয়াজেল মারগেরীৎ, তোমার কোন অসুখ করেনি তো?

—না।

—কিন্তু তোমার গালের রং দেখে মনে হচ্ছে—আমি মিছে আশঙ্কা করছি।

তার কারণ কঁন্তের প্রশ্নে আমার গাল দুটো আবার লাল হয়ে উঠেছিল। তারপর আমরা আগুনের কাছে বসলাম। কঁন্ত লুই-এর খবর জিজ্ঞেস করলেন। আমি ক্রমশ কথা বন্ধ করে, তাদের কথা শুনতে লাগলাম। তারা পলিটিক্‌স সম্বন্ধে ভূতত্ত্ব সম্বন্ধে নানা বিষয়ে কথা কইছিলেন। তারা সব কিছুই জানে! তার পর বাবা আমায় গান গাইতে বললেন। নিজে তিনি পিয়ানো খুলে একটু গান গাইলেন। তিনি আরম্ভ করলেন Traviata'র স্বর:

Di Provenza ilmar il suol

তার গলার গম্ভীর স্বর ছোট্ট ঘরের ভিতর প্রতিধ্বনিত হ'তে লাগলো গানের শেষ কলি মনে হ'লো যেন অসীমের বুকে মিলিয়ে গেল।

Dio mi…gui-da…Dio mi gui-da

তারপর মিষ্টি এবং মর্মস্পর্শী স্বরে তিনি আরম্ভ করলেন।

Ah !—il-tuo. vecchio ge·ni-tor...tu non sai quanto soffri—Tu no sai quanto soffri.

… … … …

… … … …

মনে হ'লো আমার মন যেন বিষাদে ভরে গেল, কারণ লুইয়ের কথা এবং তার হতাশায় ভরা মুখ স্মৃতিপথে ভেসে উঠলো। আমার

চোখ আবার জলে ভরে উঠলো। জানলার কাছে অন্ধকারের আলিঙ্গন আমার ভালো লাগলো; চোখের জল মুছে ফেললাম, কেউ তা দেখতে পেলে না।

গান শেষ হ'লে কঁস্ত আমার কাছে এলেন। বাবা বললেন :

—তুমি তো চমৎকার গান গাও দুনোষা। আমার তো মনে হয় প্রিশি নিজেও গানটা এত ভাবপূর্ণ করে প্রাণ দিয়ে গাইতে পারতো না।

কঁস্ত হাসলেন :

—জেনেরাল, আপনি বড় ভালো মানুষ, আপনি তো মারগেরীতের গান রোজ শোনেন; আপনার এ-কথা বলা সাজে না।

তিনি পিয়ানোর কাছে আমায় বসতে অনুরোধ করলেন। আমি গাইলাম Derniere Valse de Weber। গান শেষ হ'লে তিনি বললেন :

—এত করুণ গান আর হবে না। যেন মরণাপন্ন হংসীর গান, যেন সে তার দয়িতের কাছ থেকে শেষ বিদায় নিচ্ছে।

তিনি আমার কাছে বসে তাঁর মা'র কথা বলতে লাগলেন :

—তিনি তোমায় ভালোবাসেন। আমি অবশ্য তাতে বিশেষ আশ্চর্য হই না। তুমি এতো ভালো···তিনিও বড় ভালো মানুষ, ভালোমানুষেরা পরস্পরকে ভালোবেসেই থাকেন, নয়?

হ্যা! কিন্তু আমি একটুও ভালোমানুষ নই। আপনার মা, তিনি তো দেবী।

তাঁর সঙ্গে কথা কইতে, তাঁর কাছে থাকতে, তাঁর কালো চোখ আমার কাছে অনুভব করতে আমার যে কি আনন্দ হ'তো তা বলতে পারি না। আমার সকল দুঃখ উবে গেল।

—আপনার ভাই এলেন না কেন?

কঁস্তের ভ্রূযুগল যেন গম্ভীর হয়ে উঠলো।

—তার অসুখ করেনি তো?

—না,—হাসতে হাসতে কঁস্ত উত্তর দিলেন। গাস্ত'র কখনও শরীর খারাপ হয় না। সে খুব সৌভাগ্যবান—দেখনা মাথা ধরা আমার লেগেই আছে।

তিনি তাঁর মা'য়ের হ'য়ে আমায় অনুরোধ করলেন কিছু দিন প্রাসাদে গিয়ে বাস করবার জন্যে। আমার মা অনুমতি দিলেন। তিনি বললেন, তা'তে আমার শরীর ভালো হ'বে। কঁস্ত ও আমার মা দিনস্থির করে ফেললেন। ১০ই ডিসেম্বর আমায় যেতে হ'বে।

২৮ নভেম্বর

আজ ভালপয়েনদের দেখতে গেসলাম। বাড়ীতে কাউকে দেখতে পেলাম না। বাইরে বা'র হ'লাম, সেই সময় বাগানের ভিতর থেকে হেলেন আমার কাছে ছুটে এলো—সে আমায় দু'বার চুমু দিলে, তার পর আমার পকেটের ভিতর কিসের অনুসন্ধান করতে লাগলো। যা সে খুঁজছিলো তা পেয়ে, মাটির উপর বসে পড়ে মসলা দেওয়া রুটী খেতে খেতে দুলতে লাগলো।

—হেলেন? উৎসবের দিন প্রাসাদে গিয়ে তোর খুব আনন্দ হয় নি?

—নিশ্চয় খুব আনন্দ হ'য়েছিলো। কঁস্ত আমায় আদর করে মস্ত বড় এক টুকরো রুটী দিয়েছিলেন, এই এত বড় রুটী।

—তা হ'লে তিনি বড় ভালো মানুষ, নয়?

—কিন্তু, সে চুপি চুপি বলতে লাগলো চারদিকে চেয়ে নিয়ে—কিন্তু পৃথিবীর সব লজেন্স দিলেও আমি তা'কে একটীও চুমু দেবনা—

—কেন ? দিবিনা কেন ?

—কারণ তিনি পাজী।

—না না হেলেন ও কথা বলতে নেই ! তোর কথা সত্যি নয়—

—হ্যাঁ, সত্যি নয় ? নিশ্চয় সত্যি—যা তোমায় বলছি তা'তো মা বাবাকে সেদিন বলছিলেন।

—শোন হেলেন ! কঁস্তের মন বড় ভালো আর উঁচুদরের ! তিনি সকলকে ভালোবাসেন ! তোকেও তো তিনি পয়সা আর খাবার দিয়েছেন।

—হ্যাঁ, সে কথা তো মা'কে বল্‌লাম—কিন্তু তিনি ঘাড় নেড়ে, আমায় ঘুম পাড়াবার জন্যে নিয়ে গেলেন। ক্লদের জন্যে কি অর্দ্ধেক লজেন্স রাখতে হ'বে।

—হ্যাঁ—

যা' শুনলাম, তা আমায় ভাবিয়ে তুল্‌লে। আমার রাগ হ'লো। নিজে তিনি এত ভালো, ও এত উন্নত মন নিয়ে, আপনাকে অসৎ ইচ্ছা থেকে দূরে রাখতে পারলোনা, বিশেষ করে রাগ হ'লো মাদাম ভালপয়েন-এর উপর। কঁস্ত তার এত উপকার করেন তবু কি করে তিনি তাঁর বদনাম করেন ! মাদাম ভালপয়েনের উপর ধারণা আমার খুব উঁচু ছিল। হেলেনের কথায় আমার চমক ভাঙ্গলো—

—আমি একটা লজেন্স বেশী নিতে পারি ?

—সবই খেয়ে ফেল্‌—তোরই সব—

—কিন্তু এই তো বলছিলে ক্লদের জন্যে রাখতে !

—সত্যি ? আমি অন্য কথা ভাবছিলাম।

ক্লদের জন্য আর একটা মোড়ক আমি তার হাতে দিলাম। আমি তাকে আদর করে বেরিয়ে পড়লাম। বাবার সঙ্গে বাগানে দেখা হ'লো।

—তোর কি হ'লো মারগেরীৎ—কি যেন চিন্তা করছিস বলে মনে হ'চ্ছে।

যা এইমাত্র শুনলাম, সবই তাকে বল্‌লাম।

—মাদাম ভালপয়েনের সঙ্গে তোর দেখা হ'য় নি ?

—না, তার উপরে আমি ভীষণ চটে গেছি। তিনি হাসলেন।

—আশ্চর্য করলি! তুই রাগ করতে পরিস তা কেউই কথন আমায় বিশ্বাস করাতে পারবেনা। এই কথা বলে তিনি আমায় আদর করলেন।

—আমি লুই-এর একখানা চিঠি পেয়েছি মারগেরীৎ।

—সে ভালো আছে তো ?

—হ্যাঁ, কিন্তু সে দুঃখীত বলে মনে হয়।

—হতভাগ্য লুই!

আমার চোখে জল এলো। বাবা আশ্চর্য হ'য়ে আমার পানে চেয়ে ছিলেন। আমি তার দিকে চেয়ে রয়েছি দেখে তিনি একটু আশ্বস্ত হ'লেন।

—তার সহ্য হ'য়ে যা'বে, না হয় তার মনের ভাব বদলে যা'বে।

কিন্তু আমাকে গম্ভীর হ'য়ে থাকতে দেখে তিনি বল্‌লেন :

—চল্‌—ভগবান যা করেন সবই আমাদের মঙ্গলের জন্যে করেন।

৩০এ নভেম্বর

কাল আমরা পারী যাচ্ছি। মা, বাবা সে কথা ভাবছিলেন কিন্তু ঘুনাক্ষরেও আমায় জানতে দেননি। আজ সকালে বাবা আমার পিঠ চাপড়াতে চাপড়াতে বল্‌লেন 'যা তোর জিনিসপত্র গুছিয়ে নিগে কাল সকালে আমরা পারী যা'ব। বাবার কথা শুনে আমার মুখ

থেকে একটী কথা বার হ'লোনা—বিনা মেঘে বজ্রাঘাতের মত মনে হ'লো। বাবা হাসতে লাগলেন—

—এ কি রে! একেবারে তোর কথা বন্ধ হ'য়ে গেল যে, কি হ'ল ?

আমি হাসলাম—

—সত্যি বাবা ?

—হ্যাঁরে !

আমি আমার ঘরে উঠলাম, তারপর আরম্ভ হ'লো আমার জিনিসপত্র গোছানোর পালা। জানিনা কবে আমরা ফিরবো। মনে হয় শীঘ্রই ফিরে আসতে হবে। আমি নিজে কখনও পারী দেখিনি। লুই পারি সম্বন্ধে কত কথাই না আমায় বলেছে। আমার বড় দিদিমা সেখানে থাকেন। তার সঙ্গেও নিশ্চয় দেখা হবে।

আমার ঘর থেকে দেখতে পেলাম বাইরের দৃশ্য, যেন বেদনায় ভরা। এরই মধ্যে সকল গাছের পাতা ঝরে গেছে। সূর্য এইমাত্র অস্ত গেল। গোধূলিও আর বেশীক্ষণ থাকবে না। দেখতে পেলাম কঁস্ত আর তাঁর ভাই ঘোড়ায় চড়ে আসছেন। কঁস্ত আমায় দেখতে পেয়েছেন, তাই হাসতে হাসতে আমাকে নমস্কার জানাচ্ছেন। তিনি জানেন না কাল আমরা পারি যাচ্ছি, জানলে নিশ্চয় আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসতেন। লোকে কেন যে তার বদনাম করে তা জানি না। তিনিতো একটী মাছি পর্যন্ত মারেন না। এমন কি করেছেন তিনি যার জন্যে লোকে তাঁর বদনাম করে! তাঁর মন কত ভালো! অবশ্য কঠিনও, তাঁর সম্বন্ধে কে কি বলে তা তিনি গ্রাহ্য করেন না। তাঁর মন এবং তাঁর বিবেক যে পথ তাঁকে নির্দেশ করবে, দৃঢ় মনে তিনি সে পথের উপর দিয়ে চলে যাবেন। এখনও আমি তাঁকে দেখতে পাচ্ছি,

ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছেন অনেক দূরে। ভগবান তাঁকে আশির্বাদ করুন, তাঁকে রক্ষা করুন।

১লা ডিসেম্বর

আমরা পারীতে পৌছেছি। বড় দিদিমার বাড়ীতেই উঠেছি। তিনি কত আদর করে আমাদের বাড়ীতে নিয়ে গেলেন। আমার বাবা ও মাকে আলিঙ্গন করলেন, তারপর তিনি আমার হাত ধরলেন।

—ওঃ এই মেয়েটিই বুঝি মাংগেরীৎ? কত বড় হয়ে গেছিস রে! পারীর যুবকদের মাথা ঘুরে যাবে তোকে দেখলে।

তার কথা শুনে আমার ভারী লজ্জা হ'লো। তিনি আমার বাবার দিকে চাইলেন। বাবা একটু হেসে মাথা নেড়ে আমায় আগে উপরে উঠতে বললেন। দিদিমা জেনেভিয়েভ তাঁর বাড়ীতে আমাদের উঠতে দেওয়াতে আমার মন তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় ভরে উঠলো। দিনের বেলা আমরা লুভর্-এ ছবি দেখে বেড়ালাম। বিকেলের দিকে বাবা ও মা গেলেন এক পুরানো বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। আমি দিদিমার কাছে রইলাম। আমার সঙ্গে তিনি কত আপনার জনের মত কথা কইতে লাগলেন।

—তুই বুঝি কখনও বাড়ীর বার হ'সনি?

—না দিদিমা।

তিনি আমায় বললেন চেয়ার টেনে নিয়ে আগুনের কাছে বসতে।

—নে, এখন বল দেখি বৃটেনে কাকে কাকে চিনিস। তুই প্লুয়ার-ভ্যাদের চিনিস?

—হ্যা—

—কঁস্তেস তো দুটী সন্তান নিয়ে বিধবা হ'য়েছেন, একটি ছেলে আর একটি মেয়ে-না?

—না, তার মেয়ে নেই, দুটি ছেলে

—এখন নিশ্চয় তারা বেশ বড় সড় হয়েছে। বড়টীর নাম দ্যুনোয়া না ?

—হ্যাঁ দিদিমা, তাহলে তোমার কঁস্তেসের সঙ্গে পরিচয় আছে ?

—হ্যাঁ নিশ্চয়—তার ছেলেরা আর কঁস্তেস তোদের বাড়ীতে আসে ?

—হ্যাঁ। কঁস্তেস আমায় বড় ভালবাসেন, তিনি বড় ভাল মানুষ। আমায় আবার তার বাড়ীতে গিয়ে মাঝে মাঝে থাকবার জন্য অনুরোধ করেন। এই গেল মাসে প্রাসাদে এক বিরাট উৎসব ছিল কঁস্তের জন্ম উপলক্ষ্যে।

—তার বড়ছেলের ?

—হ্যাঁ দিদিমা।

—দ্যুনোয়াও তোদের বাড়ী আসে ?

—হ্যাঁ, প্রায়।

—রোজ ?

—না, আমি হাসতে হাসতে বললাম, তার অনেক কাজ।

—তোকে তার খুব সুন্দর আর ভালো লাগে—নয় ? দুষ্টমীর হাসি হাসতে হাসতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন।

আমার চুলের গোড়া পর্যন্ত লাল হ'য়ে উঠলো।

—তা আমি জানি না।

তিনি হাসতে লাগলেন—

—বেশ—বেশ, তোর বুড়ি দিদিমা তোকে সুন্দরী দেখলেই হলো, কি বল ?

তিনি তার ফটোগ্রাফের এলবাম আমায় দেখালেন। এলবামের মধ্যে দেখতে পেলাম লুই-এর ছবি।

—ইনি ক্যাপিত্যান লেফ্যাত্র, নয় দিদিমা ?

—হ্যাঁ সেই বটে। তুই তাকে চিনতে পেরেছিস তাহলে।

বাঃ চিনতে পর্‌বো না? তিনি যে আমাদের অতিথি হ'য়েছিলেন।

—সে প্রায় আমার সঙ্গে দেখা করতে আসে কিন্তু আজ প্রায় দুমাস হ'লো তার দেখা পাইনি।

দশটা বাজলো। দিদিমা আমায় শুতে যেতে বললেন। আমার ইচ্ছে ছিল মা আর বাবার জন্যে অপেক্ষা ক'রি কিন্তু তিনি তা'তে রাজি হলেন না।

—দেরী করে শুলে তোর গালের গোলাপের রং নষ্ট হ'য়ে যা'বে। এই কথা বলে তিনি আমায় সঙ্গে নিয়ে দোতালায় উঠলেন। শোবার ঘরের আগে একটী পোষাকের ঘর। দুটী ঘরই সুন্দর সুন্দর আসবাবে ভরা। তিনি আমায় চুম্বন করে বেরিয়ে গেলেন। অগ্নিকুণ্ডে আগুন জ্বল্ জ্বল্ করছে, আমি পোষাক ছেড়ে শোবার পোষাকে সারা শরীর ঢেকে নিলাম। খাটের কাছে নতজানু হ'য়ে বসলাম। তার পর শোবার সঙ্গে সঙ্গেই ঘুমিয়ে পড়লাম।

৩রা ডিসেম্বর

কাল বাবা রেনিএ নামে এক চিত্রকরকে ডেকে এনেছিলেন আমার একটা ছবি আঁকবার জন্যে। চিত্রকর আমার একটী স্কেচ করে নিলেন পরে অয়েল পেনটিং করবে বলে। আমরা ৭ তারিখের পর বা'র হ'বো। বাবার কয়েকজন বন্ধুর সঙ্গে আমরা দেখা করতে গেলাম। আজ বড় বেশী শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। বিছানায় পড়লাম আর ঘুমোলাম।

৪ঠা ডিসেম্বর

আজ আবার রেনিএ এসেছিলেন। তার কাজের আঠা খুব। ইচ্ছেটা একটা বিখ্যাত ছবি আঁকবে, তা'তে আমার একটুও সন্দেহ ছিলনা।

বিকেলের দিকে জানলার কাছে দাঁড়িয়ে আছি হঠাৎ দেখতে পেলাম দিদিমাকে আমার কাছে। তিনি বললেন :

—একেবারে বিভোর হ'য়ে চিন্তা করছিস যে। লোকে দেখলে বলবে কোন প্রেমিকের চিন্তায় তন্ময় হ'য়ে আছিস।

ভাগ্যি চাকর তখনও আলো আনেনি। আমি বেশ বুঝতে পারছিলাম গাল দুটো আমার লাল টুকটুকে হ'য়ে উঠেছে। তাঁর কথায় যেন আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

৮ই ডিসেম্বর

আজ আমরা ফিরলাম। বিকেল ৪টার সময় এসে পৌঁছেছি। খাওয়া-দাওয়ার পর আমি আমার ঘরে গেলাম একটু জিরিয়ে নেবার জন্যে। কাল সকালে আমায় প্রাসাদে যেতে হ'বে। তিনি নিশ্চয় জানেন না (আমি কঁস্তের কথা বলছি) যে আমরা ফিরেছি, জানলে এতক্ষণ দেখা করতে আসতেন। অসুখও তাঁর করে থাকতে পারে! না না, নিশ্চয় কাল তিনি আসবেন। আমি বড শ্রান্ত বোধ করছি।

৯ই ডিসেম্বর

তিনি আমাদের সঙ্গে দেখা করতে আসেন নি। কি হ'লো তার! আজ আমার মন ভালো নেই। সকালে বৃষ্টি হ'য়ে গেছে, ঘোড়ায় চড়তে পাই নি। বাবা আর আমি দু'জনে মোলিয়্যার পড়তে লাগলাম। পাড়াগেঁয়ে ভদ্রলোকের অবস্থা দেখে বাবা খুব হাসলেন। কিন্তু আমার একটুও হাসি এলো না।

—তুইতো হাসাছিস না মারগেরীৎ, কি হ'লো তোর?

—কি জানি বাবা, কিন্তু আমার ও-বই মোটেই ভালো লাগছে না।

বিকেল তিনটে—আকাশ পরিষ্কার, বাবা আর আমি ঘোড়ায় চড়লাম। কঁস্তেব সঙ্গে দেখা হ'লো। তিনি নমস্কার করে আমাদের সঙ্গ নিলেন। দেখে মনে হ'লো তাঁর অসুখ করেছে। আমরা যে বেড়াতে গিয়েছিলাম সে কথা তিনি জানতেনই না। তিনি বললেন কাল আমায় প্রাসাদে নিয়ে যা'বার জন্যে আসবেন। প্রায় চার ঘণ্টা আমরা ঘোড়ায় চড়ে বেড়ালাম। মেঘের ফাঁকে সূর্য মাঝে মাঝে চকচক্ করে উঠছিলো। বাবা কঁস্তকে পারীর কথা বলছিলেন। মনে হ'লো কঁস্ত বাবার কথা শুনছিলেন। কিন্তু আমি বেশ বুঝতে পারলাম তিনি আর কিছু ভাবছেন। ছোট পাহাড়ের কাছে এসে তিনি বিদায় নিলেন। নয় তাঁর অসুখ করেছে নয় কোন কিছু একটা তাঁকে ভাবিয়ে তুলেছে, কারণ যা'বার সময় তিনি ফিরেও চাইলেন না বা অভ্যাস মত টুপিও নাড়লেন না।

১১ই ডিসেম্বর

তিনি আমায় নিতে এলেন, গাড়ী করে মা'কে সঙ্গে নিয়ে। সূর্যের সঙ্গে মেঘের চলেছিল তখন যুদ্ধ। অসম্ভব শীত। কঁস্তেস আমায় আদর করে চুম্বন করলেন। আমি গাড়ীতে প্রবেশ করলাম। তিনি আমায় তাঁর পাশে বসালেন। দেখে মনে হ'ল কঁস্তের আনন্দ আবার ফিরে এসেছে। তাঁর মা জোর করে তাঁকে আমাদের গাড়ীতে তুলে নিলেন। তিনি গাড়ীতে উঠলেন। আমরা পর্দা ফেলে দিলাম। জনমানব শূন্য মাঠের উপর দিয়ে আমাদের গাড়ী ছুটে চললো। প্রাসাদে পৌছাতে কঁস্তেস আমাদের নিয়ে বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন। সেখানে বসে আমরা নানা বিষয়ে কথা

কইলাম। গাস্ত বাড়ী ছিলো না। আমি আমার ঘরে উঠে বিছানার উপর টুপি আর লোমে-ভরা ওভার কোটটা খুলে ফেলে দিয়ে জানলার কাছে এসে দাঁড়ালাম। সারা গ্রাম যেন মরুভূমির মত মনে হ'চ্ছিল। বাইরে বায়ু গুমরে চ'লেছে। গাছের ডালগুলো পত্রবিহীন হ'য়ে এদিকে ওদিকে দুলছে। সেই বিষাদময় দৃশ্যের দিক থেকে মুখ ফিরিয়ে আমি আগুনের কাছে এসে বসলাম। শীঘ্রই নীচে নামলাম। সিঁড়িতে কঁন্তের সঙ্গে দেখা হ'লো।

—আজ আর আমরা বা'র হ'তে পারবো না। চল প্রাসাদের আনাচে কানাচে কোথায় কি আছে সব দেখে বেড়ান যা'ক।

—আনন্দের সহিত।

প্রথম তিনি আমায় নিয়ে গেলেন বইয়ে ভরা প্রকাণ্ড পড়বার ঘরে। ঘরখানা সেই বংশের বংশধরদের ছবিতে ছবিতে ভরা। ঘরখানায় মোটে চারটে জানলা সেই জন্যে একটু অন্ধকার।

—এই দেখ কাথারীনের মূর্তি—ভালোবাসা হ'য়ে ছিলো ওর মৃত্যুর কারণ। এই দেখ তার ভাই—ঋষি সেভালিএ। তিনি সব ছবি-গুলির বর্ণনা একে একে আমায় দিতে লাগলেন।

—মাটির নীচে যে রাস্তা আছে তা দেখবে ?

—নিশ্চয় !

—ভয় করবে না ! তিনি হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলেন।

—কিসের ভয় !

—ভয়ানক অন্ধকার, তার উপর লোকে বলে ৯০৯ সালে আর্থুর দে প্লুয়ারভ্যা ওখানে একজনকে খুন করে। কাঠের তক্তাগুলোর উপর এখনও রক্তের দাগ আছে।

—না, আপনি কাছে থাকলে আমার ভয় করবে না। তাঁর ভ্রূযুগল গম্ভীর হ'য়ে উঠলো, কিন্তু তিনি আমার কথা শুনে মৃদু হাসলেন।

পর্দায় ঢাকা দরজাটা তিনি খুলে ফেললেন, তারপর আমার হাত ধরে মাটির নিচের সিঁড়ি দিয়ে নামতে লাগলেন। দিনের আলো সে সুড়ঙ্গের ভিতর যায় না কেবল ঝাঁঝরি দেওয়া গর্তের ভিতর দিয়ে মাঝে মাঝে ক্ষীণ আলোকরশ্মি এসে সুড়ঙ্গের ভিতরটা যেন আরো অদ্ভুত করে তুলেছে। লম্বা সুড়ঙ্গ—অনেক লম্বা, প্রায় গভীর রাত্রের মত অন্ধকার। তাঁর হাতের ভিতর হাত রেখে চলাতে আমার একটুও ভয় করছিল না। প্রায় পনের মিনিট চলার পর দেখতে পেলাম একটা ছোট নীচু দরজা। তিনি দরজা খুলে ফেললেন। আমরা মাঠের উপর এসে পড়লাম। বৃষ্টি পড়ছিল না, কঁস্ত বাইরে থেকে একটি স্প্রিং টিপে দরজাটা বন্ধ করলেন।

—সুড়ঙ্গ থেকে বা'র হ'য়ে আমরা বুকভরে নিঃশ্বাস নিলাম।

—হাওয়া শিস দিয়ে চলছে। আমরা শীঘ্রই বাড়ী ফিরলাম। গ্রামের পুরোহিত মঃ রেকামিয়ে আজ আমাদের সঙ্গে খেলেন। বড ধার্মিক লোক তিনি, অনুকম্পায় তার হৃদয় ভরা তিনি ছিলেন কঁস্ত ও তার ভাইয়ের গুরুদেব, নিজের সন্তানের মত তাদের ভালোবাসেন।

রাত্রে অগ্নিকুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ভাবছিলাম সারা দিনের ঘটনা। শুনতে পেলাম কে দরজায় করাঘাৎ করলে। কঁস্তেস প্রবেশ করলেন। আমার কাছে বসে তিনি আমায় কাছে টেনে নিলেন। আমি তাঁর কাঁধের উপর মাথা রাখলাম।

কি ভাবছিস তুই? নিশ্চই সুখের স্বপ্ন দেখছিস—তোর মুখ দেখে মনে হ'য় তোর কোন দুঃখ নেই।

আমি কোন উত্তর না দিয়ে, যে হাতে করে তিনি আমার হাত ধরে ছিলেন সেই হাতের উপর চুম্বন দিলেম। তিনিতো তাঁরই মা; তিনিই তো তাঁকে মানুষ করেছেন, তাঁকেই তো তিনি বুকের দুধ পান করিয়েছেন, তিনিই তাকে বড় করে তুলেছেন। তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতায় আমার মন ভরে উঠলো।

—শোবার আগে আমার অভ্যাস ছেলেদের একবার দেখে যাওয়া। যখন তারা ছোট ছিল তখনও এই অভ্যাস ছিল; অভ্যাস এখনও গেল না। তাদের দেখে তোকে দেখতে এলাম—কারণ তোকে আমার মেয়ের মত ভালোবাসি—তুইও আমায় ভালোবাসিস নয়? গাস্ত আর দুনোয়ার মতই ভালোবাসিস?

—হ্যাঁ, আমি আপনাকে খুব ভালোবাসি। গেল সপ্তাহে কঁস্তের বুঝি শরীর ভালোছিল না?

—না, বিশেষ কিছু হয়নি। কিন্তু তাকে কঁস্ত বলিস কেন তুই? তাকে ছোট করে দুনোয়া বলে ডাকলেই পারিস। যখন তোর বয়েস চার বছর, তখন তুই তাকে নাম ধরে ডাকতিস। আমার লজ্জা দেখে তিনি হাসলেন।

—নে, ঘুমিয়ে পড ঘুমবার সময় দেব দূতেরা তোকে রক্ষা করবেন।

আমায় আলিঙ্গন করে তিনি চলে গেলেন। শয্যার কাছে নতজানু হয়ে আমি ভগবানকে ডাকলাম। ভগবানকে বললাম তিনি যেন লোভ থেকে আর যা কিছু আমাদের পক্ষে ভালো নয় তা থেকে আমাদের রক্ষা করেন। শোবার আগে আমি জানলার পর্দা খুললাম। সারা পৃথিবী অন্ধকার। জানলায় বাধা পেয়ে হাওয়া গুমরে উঠছে। আকাশ তারায় ভরা। কি সুন্দর দৃশ্য! "আকাশ প্রকাশ করছে ভগবানের কাজ, আর ধরণী দেখাচ্ছে তার হাতের কাজ"। কথা

গুলো কত সত্যি! তারায় তারায় ভরা আকাশ দেখলে মানুষ স্বতঃই অনুভব করে ভগবানের কাজ কত মহান। আমি বিছানায় শুয়ে পড়লাম। সারা প্রাসাদ তখন ঘুমিয়ে পড়েছে।

১২ ডিসেম্বর

কাল প্রথম বরফ পড়েছে। ঘুম ভেঙ্গে আমি শার্শির কাঁচের ভিতর দিয়ে দেখলাম সমস্ত মাঠ সাদা হয়ে গেছে। কী সুন্দর। পৃথিবী সন্ন্যাসিনীর শুভ্র বেশ পরেছে। পৃথিবীর যা কিছু কালো, যা কিছু কুশ্রী সব ঢাকা পড়ে গেছে সেই শুভ্র বসনে। জানেৎ ঘরে ঢুকলো আগুন জালবার জন্যে।

—প্রাতঃপ্রণাম মাদমোয়াজেল! বড শীত পড়েছে, আর মাদ-মোয়াজেল বড সকাল সকাল উঠেছেন।

—তোর চেয়ে সকাল সকাল উঠিনি জানেৎ। সে হেসে চলে গেল। ৮টার সময় আমি বসবার ঘরে নামলাম। গাস্তঁকে দেখতে পেমাল না। তিনি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে ছিলেন—প্রথমে তিনি আমায় দেখতে পেলেন না।

—একলা দাঁড়িয়ে আছেন মঁঃ গাস্তঁ?

তিনি মুখ ফেরালেন।

—তুমি তো বার হ'তে পারবে না মদমোয়াজেল—যা আবহাওয়া।

তুলোর মত বরফ ঝরে পড়ছে।

—না, দৃশ্য এত সুন্দর যে সে জন্য আমার একটুও দুঃখ হচ্ছে না।

—বিরক্ত হবেন।

—না···মনে হয় না—

—কঁস্তেস প্রবেশ করলেন

—হুনোয়ার অসুখ করেছে—তার মাথা ধরেছে।কি বিচ্ছিরী রোগ !

—তিনি কি আসবেন না ?

—আসবে বইকি, ও যে বড় একগুয়ে, নিজের যত্ন একটু নেই।

কঁস্ত এলেন—তিনি আমায় নমস্কার জানালেন।

—তাঁর মুখ যেন রক্তহীন—রগের শীরাগুলো নীলবর্ণ ও চক চক করছিল—স্বচ্ছ চর্মের ভিতরে শীরা গুলোকে দেখা যাচ্ছিল। তিনি বললেন

—সারা রাত আমার ঘুম হয় নি।

গাস্তঁ বেরিয়ে গেলেন। কঁস্তেস বললেন

—তুই নামলি কেন হুনোয়া ! শুয়ে পড় শোফার উপর।

তিনি শোফার উপর শুয়ে পড়ে চোখ বুজলেন।

—এখানে তোর খাবার দিয়ে যাবে ; নড়িসনি হুনোয়া। কঁস্ত, একটু হেসে সম্মতি জানালেন। তারপর আমরা খাবার ঘরে নামলাম। খাওয়া দাওয়ার পর কঁস্তেস নিজে তাঁর পুত্রের জন্য কফি নিয়ে গেলেন। কফির ট্রে'টা আমি তার কাছ থেকে চাইলাম। শেষ পর্যন্ত তিনি ট্রে'টা আমার হাতে দিলেন : আমরা বসবার ঘরে ঢুকলাম। কঁস্ত খেতে পারলেন না। তাঁর ভীষণ তৃষ্ণা পেয়েছিল ; ক্রীম মেশান দু কাপ কফি পান করলেন। গাস্তঁ এক মুহূর্তের জন্যে এসে আবার বেরিয়ে গেলেন—বাইরে বরফ পড়া সত্ত্বেও। আমার মনে হলো কঁস্ত ও তার ভায়ের মনের মিল নেই কারণ সারা দিন তারা কথা কইল বলে মনে হলো না। কঁস্ত আমায় অনুরোধ করলেন কোন বই পড়ে শোনাবার জন্যে, অবশ্য যদি তাতে আমার কষ্ট না হয়। আমি তাঁর কাজে লাগবো এই ভেবে আনন্দ হলো। আমি আনন্দের সহিত পড়তে সুরু করলাম। কঁস্তেস ঘর থেকে বেরিয়ে গেলেন কাজ আছে বলে। আমি পড়েই

চলেছি। তিনি ক্রমশঃ ঘুমিয়ে পড়লেন। আমি বই বন্ধ করে যড়ষড় হয়ে বসে রইলাম, পাছে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এই ভয়ে। আগুনের দিকে চেয়ে ভাবতে লাগ্লাম, কিছু তার মনকে চঞ্চল করেছে কারণ আমি বেশ বুঝতে পেরেছিলাম যে কোন কারণে হ'ক তিনি বিরক্ত হয়েছেন—এমন কি ঘুমন্ত অবস্থায়ও তিনি চমকে উঠছেন আর খুব আস্তে আস্তে গোঙাচ্ছেন, নিশ্চয় কোন কষ্টকর স্বপ্ন দেখছেন। প্রায় তাঁকে জাগিয়ে ছিলাম আর কি। মিনিট পনের পরে তিনি স্থির হয়ে গভীর ভাবে নিদ্রা গেলেন বলে মনে হলো। তাঁর মা ঘরে ঢুকলেন। পুত্রকে নিদ্রিত দেখে তিনি আমার কাছে এসে বসলেন। তিনি তার কোলের উপর আমার মাথা নিয়ে আমার চুলের ভিতর হাত বুলাতে বুলাতে তার পুত্রের দিকে চেয়ে রইলেন।

—ওকে দেখতে সুন্দর, নয়?

—আমি উত্তর দিলাম না।

ঠিক ওর বাপের মত দেখতে কিন্তু ওর ধৈর্য নেই ওর বাপের মত। আমার ইচ্ছে ওর বিয়ে দি। তোর মত একটী মেয়েকে যদি বিয়ে করে তা হলে আমি সুখে মরতে পারি।

আমি লজ্জায় লাল হ'য়ে উঠলাম। তিনি তা দেখতে পেলেন।

—তুই ওকে ভালোবাসিস? তিনি মৃদুস্বরে আমায় জিজ্ঞাসা করলেন। তার পোষাকের ভিতর আমার মুখ লুকাতে তিনি বল্লেন।

—আরে! লজ্জার কি আছে। ও-কি তোর যোগ্য নয়, না তুই ওর যোগ্য ন'স? আমার ইচ্ছেটা ওর বউ দেখি। ওকে দেখা শোনা করবার জন্যে আর ভালোবাসবার জন্যে তো কারুকে চাই—ওর হ'তভাগা মা'র মত। তিনি আমার মাথা তুলে ধরলেন এবং আমায় স্নেহভরে চুম্বন করলেন।

—তোকে আমি বড় ভালোবাসি কারণ তুই আমার দুনোয়াকে ভালোবাসিস।

তার দুই চোখ দিয়ে অশ্রুধারা ঝরে পডলো আমার চুলের উপরে। তিনি বললেন :

—তুই সত্যিকারের কঁন্তেস হ'তে পাববি। আমরা সেখানে বসে রইলাম প্রায় এক ঘণ্টা—তিনি আমার হাতখানি তাঁর হাতের মধ্যে নিলেন। তারপর সশব্দে ঘরের দরজা খুলে গাস্তঁ প্রবেশ করলো। কঁন্তেস নিজের ঠোঁটের উপর হাত রাখলেন—কিন্তু ততক্ষণ কঁন্ত উঠে পড়েছেন। তিনি ঘুমিয়ে পড়ার জন্যে লজ্জিত হ'য়ে ক্ষমা চাইলেন। কিন্তু তিনি ঘুমিয়ে পড়েছিলেন বলে আমি সুখীই হ'য়ে ছিলাম—সে কথা আমি তাকে বল্‌লাম। তিনি হেসে আমার করমর্দন করে বল্‌লেন ;

—আর কেউ হ'লে নিশ্চয় রাগ করতো—তোমার মন ভালো মাদমোয়াজেল মারগেরীৎ তাই

আমি ছুটে পালালাম আমার ঘরে। ঘরের মধ্যে নতজানু হ'য়ে বসলাম ; আমার বিপুল আনন্দ। সান্ধ্যভোজনের পর আমি আমার ঘরে উঠলাম। যখন বসবার ঘরে নামলাম তখন দেখলাম কঁন্তেস বসে রয়েছেন, আর তার পায়ের কাছে বসে রয়েছেন কঁন্ত তাঁর মায়ের হাঁটুর উপর মাথা রেখে। আমি চলে যাচ্ছিলাম—কঁন্তেস আমায় ডাকলেন।

—আয় আমার পাশে বোস—কারণ তুই যে আমার মেয়েব মত।

১৩ই ডিসেম্বর

আজ সকালে খাবার ঘরে এসে দেখলাম কেউ নেই, কঁন্তেস একটু পরেই ঘরে প্রবেশ করলেন

—দ্যুনোয়া আর গাস্ত কোথা ?

—জানিনা তো !

তিনি বুড়ো চাকর আরথুরকে ডাকলেন।

—হ্যাঁ রে তোর দাদাবাবুরা কোথা গেল ?

—ভোর বেলা তাদের বার হ'তে দেখেছি—একজনের পর আর একজন বেরিয়ে গেলেন।

—সত্যি ! আশ্চর্য তো ! আস আমরাই খেতে বসি। আশা-করি তারা এসে পড়বে।

বলতে বলতেই তার বড় ছেলে এসে পড়লেন। দেখে মনে হ'লো তিনি যেন ভীষণ বিরক্ত হ'য়েছেন এবং ভীষণ রেগে আছেন। কুঞ্চিত ভ্রূ-যুগের নিচে দুটা চোখ দিয়ে যেন বিদ্যুৎ বা'র হ'চ্ছে।

—তুই কি বলতো দ্যুনোয়া ! এই শীতে, সকাল বেলা কোথা গেস্‌লি তুই ?

—ভেবেছিলাম বেড়িয়ে এলে শরীরটা ভালো হ'বে মা। একটু হেসে তিনি তাঁর স্বাভাবিক ভাব ফিরিয়ে আনবার চেষ্টা করলেন।

—গাস্ত কোথা ?

—জানিনা—যেন তাচ্ছিল্য ভাবে উত্তর দিলেন।

তাঁর মা অবাক হ'য়ে ও চিন্তিত ভাবে তাঁর পানে চাইলেন। সেই সময় গাস্ত প্রবেশ করলেন, উজ্জ্বল তার মুখমণ্ডল। দু-জনের মধ্যে এমন কিছু একটা ঘটেছে যা'র জন্যে খেতে বসে কেউ কা'রো সঙ্গে কথা কইলেন না।

খাবার সময় পুরোহিত বেকামিয়ে এলেন আমাদের সঙ্গে দেখা করতে। তিনি গাস্তকে অনুরোধ করলেন তাঁর সঙ্গে তাঁর বাড়ী

পর্যন্ত যা'বার জন্যে। গাস্ত তাঁর অনুরোধ এড়িয়ে যা'বার চেষ্টা করলেন কিন্তু পুরোহিত ছাড়লেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি রাজী হ'লেন।

১৪ই ডিসেম্বর

কঁস্তের অসুখ, ভীষণ অসুখ। সে কথা তিনি তাঁর মাকে বলেছেন; আমিও শুনেছি তাঁকে সে কথা বলতে। ঘরের ভিতর ঢুকতে যাচ্ছি এমন সময় তার পীড়িত কণ্ঠস্বর আমার কানে এলো, মা'কে যেন অনুনয়ের সুরে বলছেন—মা আমি আর পারছি না, না মা আমি আর পারছি না, আমায় আর জোর কোরোনা।

মিষ্টি সুরে কঁস্তেস বললেন।

—তোর যে অসুখ ডুনোয়া!

হ্যাঁ হ্যাঁ মা বড অসুখ, ভীষণ অসুখ।

আমার ঘরে উঠলাম। ঘরের দরজায় খিল দিলাম। তা হ'লে কঁস্ত পীড়িত, ভীষণ পীড়িত। মনে হ'লো যেন কোন বিপদ আমার উপরে ভেঙ্গে পড়বে। হায় ভগবান, তিনি নিশ্চয় মারা যা'বেন না। না—না—না তাঁকে বাচিয়ে দাও ভগবান। কিন্তু তাঁর অসুখতো এখনও সারেনি। তাঁর সেই বেদনাময় কণ্ঠস্বর! "ভীষণ অসুখ"! তোমায় মিনতি করছি ভাগবান তাঁকে বাঁচিয়ে দাও, তিনি যেন মারা না যান। বহুক্ষণ নতজানু হ'য়ে প্রার্থনা করবার পর, আমি অনেকটা শান্ত হ'লাম। নিচে বসবার ঘরে গেলাম। কঁস্তেস সোফার উপর বসে আছেন আর তিনি তার কোলে মাথা রেখে শুয়ে আছেন। কঁস্তেস যেন কি চিন্তা করছেন। তাকে একটু যেন বিমর্ষ বলে মনে হ'চ্ছিল। আমার গলার আওয়াজ পেয়ে তিনি উৎফুল্ল ভাবে কথা কইবার চেষ্টা করলেন। ডুনোয়া র বড় বড় কৃষ্ণ চোখের দৃষ্টি আমার উপরেই ছিল

কিন্তু তিনি কোন কথা বললেন না। তাঁ'র চোখে একটা অদ্ভুত স্নেহময় ভাব, বাধ্য হ'য়ে আমায় কথা কইতে হ'লো—এখনো কি মাথা ব্যথা করছে? আমি জিজ্ঞাসা করলাম

—না, ধন্যবাদ—বড় দুর্বল, আর কিছু নয়—

তার মা উঠে চলে গেলেন। আমি বেশ দেখতে পেলাম তার কাঁদ কাঁদ ভাব। কিছু পরেই গাস্তঁ এসে আমাদের সঙ্গে যোগে দিলেন—তিনি বেরিয়ে ছিলেন, এই মাত্র এলেন। তিনি বললেন—

—বাইরে অসম্ভব শীত—এই কথা বলে তিনি অগ্নিকুণ্ডের দিকে এগিয়ে গেলেন :

—বেরিয়েছিলি কেন ত'বে তুই?—হঠাৎ তাঁর ভাই তাঁর মুখের দিকে সোজা সুজি চেয়ে বল্‌লেন।

—কারণ…হাসতে হাসতে ও লজ্জিত ভাবে গাস্তঁ বল্‌লে। দুনোয়াকে রাগ করতে দেখে আমার দুঃখ হ'লো। আমি কঁন্তেসকে বললাম বাড়ী যা'বো। তিনি রাজী হ'লেন না। শেষ পর্যন্ত সকলে মিলে আমার যাওয়ার দিন ঠিক করলেন ১৭ তারিখ।

আজ রাত্রে—প্রায় তখন রাত দশটা—শুতে গিয়ে ঘরের জানলা খুললাম, কারণ ঘরে যেন আমায় নিশ্বাস বন্ধ হ'য়ে যাচ্ছিল। শুনতে পেলাম গাস্তঁর গলার স্বর। তিনি জানলার কাছে দাঁড়িয়ে একটী গান গাইছেন। গায়ক গান গাইতে গাইতে এগিয়ে গেলেন—তার গানের সুর সুদূরে মিলিয়ে গেল, কিন্তু মাঝে মাঝে তার গলার গম্ভীর সুর আমার কানে আসতে লাগলো।

আমি জানলা বন্ধ করে দিলাম। বিছানায় শুয়ে পড়লাম। ভগবান আমাদের সকল বিপদ থেকে উদ্ধার করুন।

২ জানুয়ারী ১৮৬১

কেমন করে লিখব! কেমন করে সব ঘটনার বিবরণ দেব! যা' দেখলাম তার আগে আমার মৃত্যু হ'লে ভালো ছিল। এ ঘটনার আগে আমার কেন ধরিত্রীর বুকে স্থান হ'লো না। আজ বুঝতে পারলাম, পাদরীসাহেব কেন বলে ছিলেন—"যা'রা মৃত তাদের আমি আশীর্বাদ করি, জীবিত যা'রা তাদের চে' বেশী করে আশীর্বাদ করি মৃতদের"। অনেক দুঃখ অনেক বেদনাময় দৃশ্য দেখেছিলেন তাই তিনি চিৎকার করে বলে উঠেছিলেন ও কথা। হায় ভগবান! যে কথা আজ আমি লিখতে যাচ্ছি তা কী করুণ। মঙ্গলময় আমরা পাপী, দল থেকে বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়া মেষের মত, আমরা পথহারা। আমাদের ক্ষমা কর—আমাদের আবার ঠিক পথে নিয়ে যাও। এত উন্নত তার মন, এত ভালো তিনি, তিনি তাঁর ভাইকে হত্যা করেছেন। কে তাকে প্ররোচিত করলো এই পাপ কাজ করতে! তাঁর নিজের ছোট ভাই! এক মায়ের পেটে ভাই! তার পরিবর্তে আমার মরতে ইচ্ছে যায়। তাঁকে ক্ষমা করো ভগবান। তুমি তাঁকে কমা করবে, তাঁকে ক্ষমা করবে তো ভগবান! তুমি সকলকে ক্ষমা করো। তাঁর অসুখ, ভীষণ অসুস্থ। সে নিজের ইচ্ছেয় এ গুরুতর পাপ কাজ করেনি। তাঁর অসুখই তাঁকে জোর করে একাজ করিয়েছে, সে তাঁর ভাইকে স্নেহ করতো—তাঁকে কখনও সে একটা রূঢ় কথা বলেনি—মঙ্গলময় যিশু তাঁ'কে ক্ষমা কোরো, নির্মল করে দাও তাঁকে, পাপ মুক্ত করে দাও, তাঁর বেদনায় শান্তি দাও। আমি সব কথা লিখছি।

সেদিন ছিল ১৫ই ডিসেম্বর। সকাল ৫টার সময় আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল বন্দুকের শব্দে। আমি চমকে উঠে পড়লাম। জানলা খুলে

ফেললাম, চারদিক নিস্তব্ধ। প্রায় আধ ঘণ্টা দাঁড়িয়ে রইলাম। আমি বিছানায় শুতে যাচ্ছি, শুনতে পেলাম কারা যেন কথা কইছে। আমি পোষাক পরে নীচে নেমে এলাম। সবেমাত্র অল্প অল্প উষায় আলো ফুটে উঠেছে তখন। অন্ধকার বারান্দায় দেখতে পেলাম একদল লোক। আমাকে দেখতে পেয়ে বুড়ী ধাইমা ছুটে এলো।

—মাদমোয়াজেল তাকে পুলিসের হাত থেকে বাঁচাও—সে চিৎকার করে আমায় বললে।

আমি দেখতে পেলাম কঁন্ত দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তাঁর দুপাশে দুজন পুলিশ, হাত বাঁধা। ব্রিগাদিয়ে আমার কাছে এগিয়ে এলো।

—কি করছেন আপনি? ঘৃণাভরে আমি তাকে বললাম—আপনি কি জানেন না উনি কঁন্ত দে প্লুয়ারভ্যা।

সে আমার কথায় মুখ ফিরিয়ে নিলে। ব্রিগাদিয়ে কি বলতে যাচ্ছিলেন তাকে আমি কথা বলতে সুযোগ না দিয়ে বললাম।

—আপনি হয়ত ভুল করছেন—এর ফলভোগ করতে হবে আপনাকে।

—আমার ভুল হ'লে সুখি হতাম মাদমোয়াজেল। কিন্তু কঁন্ত যে তার ভাইকে হত্যা করেছে এটা খুব সত্যি।

ভাইকে হত্যা করেছে! তার কথা আমি ঠিক বুঝতে পরলাম না। আমি কঁন্তের দিকে চাইলাম; তাঁর বিস্ফারিত চোখ খাবার ঘরের দরজার উপর নিবদ্ধ; স্ফীতনাসারন্ধ্র, দৃঢ়বদ্ধ অধর সবই যেন তাঁর উত্তেজনাকে সুপ্রকাশ করছে। আমি আবার কঠিন স্বরে ব্রিগাদিয়েকে বললাম সে ভুল করেছে। সে বললে:

—আপনি ভিতরে আসুন? সেই সঙ্গে সে খাবার ঘরের দরজা খুলে ধরলো। আমি প্রবেশ করলাম, সে-ও আমার পিছনে পিছনে

প্রবেশ করে খাবার ঘরের দরজা বন্ধ করে দিলে। হে ভগবান! চোখের সামনে যা দেখলাম তা আমি জীবনে ভুলতে পারবো না। টেবিলের উপর গাস্তঁর মৃতদেহ শুইয়ে রাখা হয়েছে। তার দুটি ঠোঁট উন্মুক্ত, তার কাঁচের মত চোখ অসম্ভব রকমের বড় বড় হয়ে উন্মুক্ত হ'য়ে রয়েছে। তার কামিজ, তার পোষাক, কালো কালো রক্ত মাখা; ডান দিকের বুকে গুলি বিদ্ধ হয়েছে।

—ওর ভাই-ই ওর এ অবস্থা করেছে! আমি নীচু গলায় বললাম।

—হ্যাঁ মাদমোয়াজেল।

—আপনি সুনিশ্চিত?

—হ্যাঁ মাদমোয়াজেল; আমরা যখন বঁদে ছিলাম উনি নিজেই আমাদের কাছে গিয়ে ধরা দিয়েছেন,—সে করুণাপূর্ণ স্বরে বললে।

আমি বাইরে গিয়ে দ্যুনোয়ার কাছে এগিয়ে গেলাম। তার হাতের উপর হাত রেখে তার মুখের পানে চাইলাম। ভগবান! কি ভীষণ তার পরিবর্তন হয়েছে। তার বড় বড় কালো চোখ থেকে যেন বিদ্যুৎ বার হচ্ছে, দুই রগের শিরার স্পন্দন সুস্পষ্ট ভাবে দেখা যাচ্ছে।

—দ্যুনোয়া, তোমার অসুখ করেছে, আমার সঙ্গে আসবে? আমি নীচু গলায় বললাম।

আমার গলার আওয়াজে সে আমার দিকে ফিরলো। তার চোখের দৃষ্টি আবার কোমল হয়ে উঠলো। আমার বুক ভেঙে যাচ্ছিলো। হে ভগবান কী দারুণ বেদনা।

—যদি আমি যেতে চাই? নিঃসন্দেহে, আনন্দের সহিত সে উত্তর দিলে।

সেই সময় তার চোখ পড়লো তার বাঁধা হাতের উপর। পাগলের মত সে সেদিকে চেয়ে রইলো, তারপর হঠাৎ শিশুর মত চিৎকার করে বলে উঠলো।

মারগেরীৎ, এ—এ-কি!

আমি তার হাতের বাঁধন খুলে দিলাম এবং পাশের ঘরে তাকে নিয়ে গেলাম। সে কোন আপত্তি করলো না। আমি দরজা বন্ধ করলাম, সে একটা সোফার উপর বসে পড়ে দু'হাতে তার মাথা চেপে ধরলো। আমি তার পাশে বসে কিছুক্ষণ তার পানে চেয়ে রইলাম। ওগো প্রিয়তম, এখন আমি বুঝতে পারলাম কত যে তুমি প্রিয়তম। আমি তার হাত আমার হাতের ভিতর নিলাম—উত্তপ্ত কম্পমান হাত। আমি কোন কথা বল্‌লাম না। আমরা কিছুক্ষণ সেখানে বসে রইলাম, তারপর আমাদের কানে এলো কঁন্তেসের গলার মিষ্টি স্বর।

—কি হ'য়েছে? আমার ছেলেরা কোথা?

জুনোয়া হঠাৎ চোখ তুললো, তার দৃষ্টি নিবদ্ধ হ'লো ঘরের দরজার উপর, সে শুনতে লাগলো।

—মা! মা আসছেন! সে মৃদু স্বরে বললে।

দরজা খোলবার শব্দ কানে এলো। বুক-ভাঙ্গা এক চিৎকার, জুনোয়া কেঁপে উঠলো। তারপর আমার কানে এলো উৎকণ্ঠা ভরা গলার স্বর।

—গাস্তঁ, গাস্তঁ, গাস্তঁরে•••!

তার পর গুমরে ওঠা কান্না! কিছু পরে সব চুপ চাপ। আমি উঠলাম। চিৎকারের পর থেকে সে চোখ বুজে আছে; কেবল তার সর্বাঙ্গে একটা মৃদু কম্পন। আমি ঘরের বার হ'য়ে গেলাম। কঁন্তেস আমায় দেখতে পেয়ে আমার দুই হাতের মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়লেন।

—মারগেরীৎ, একি হ'লো মারগেরীৎ—তিনি ফুপিয়ে কেঁদে উঠলেন! মনে হ'লো তার বুক ভেঙ্গে যা'বে।

—চুপ করুন! কঁস্ত ও ঘরে রয়েছে, তার ভীষণ অসুখ, আপনাকে তার প্রয়োজন।

তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। তাঁর জীবিত পুত্রকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। আমি ব্রিগাদিয়েকে বল্‌লাম তার লোক-জন নিয়ে চলে যেতে। তার পর আমি ঘরে ঢুকলাম। মা কাঁদছিলেন কিন্তু সে, সে যেন কিছু বুঝতে পারছিলনা—তার মা'র মুখের পানে আশ্চর্য হ'য়ে চেয়ে আছে। আমি তাদের হাত ধরে উপরে কাঁস্তসের ঘরে নিয়ে গেলাম। ভেবেছিলাম ঘরের ভিতর তাদের রেখে চলে যা'বো। কিন্তু কঁস্তেস আমার হাত ছাড়লেন না।

—যাস্‌নে—তিনি বল্লেন। আমি তার কাছে বসলাম। ওঃ দুনোয়া, তুই কি করলি, কেন করলি এমন কাজ? কঁস্তেস তার পুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন। তার নিরাশ দৃষ্টি কঁস্তের চোখের উপর বিন্যস্ত!

সে মাব দিকে অবাক হ'যে চেয়ে থাকতে থাকতে বিরক্তি ভরে হঠাৎ বলে উঠলো।

—মা আমায় ঘুমোতে দাও, আমার মাথার ভিতরে জ্বলন্ত আগুন! তাকে নিভিয়ে দাও।

তিনি কঁস্তকে বুকে জড়িয়ে ধরলেন। সে কঁস্তেসের বুকের উপব মাথা রেখে চোখ বুজলো।

—উঃ আমায় পুড়িয়ে মারছে মাথার আগুনটা—সে কপালে হাত বুলোতে বুলোতে বিড বিড় কবে বলতে লাগলো।

তাঁর মা তাকে প্রশ্ন করতে যাচ্ছিলেন, আমি তাঁকে বারণ করলাম। আমি ডাক্তার ডাকতে পাঠালাম। মঃ সাঁস্তো শীঘ্রই এসে পড়লেন। আমি তার সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতর গেলাম। তিনি আমার কাছ থেকে সব কথা শুনলেন। আমার কথা শেষ হ'লে তিনি বললেন:

—যা শুনলাম তা থেকে মনে হয় কঁস্ত যখন এই ভয়াবহ কাজ করে তখন তার মাথার ঠিক ছিল না। ঘটনার কারণ কিছু জানো না?

—না। এদের তো মনোমালিন্য ছিল না, পরস্পর তো পরস্পরকে স্নেহ করতো।

—কোন একটা কারণ নিশ্চয় আছে মনোমালিন্যের।

—না। গেল মাস থেকে কঁস্তের হাবভাব যেন একটু পরিবর্তন হ'য়েছিল আমার মনে হয় কিন্তু আর কেউ তা লক্ষ্য করেনি।

তিনি আমার পানে অনুকম্পা মিশ্রিত করুণাপূর্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে রইলেন।

—তোমার বাবা এ ব্যাপার শুনেছেন? আমার বিশ্বাস হয়তো তিনি সব শুনেছেন।

এক মিনিট চুপকরে থাকবার পর—

—এখন কঁস্তকে একবার দেখবার সুবিধে হবে? তার অবস্থা সম্বন্ধে নিশ্চিত হওয়া প্রয়োজন। যদি প্রমাণ করতে পারা যায় মস্তিষ্ক বিকৃতির ফলে সে এ কাজ করেছে তা হলে শুনানীর দিন তাকে বাঁচান যেতে পারে।

ডাক্তারের শেষ কথা আমার চোখের সামনে সুস্পষ্ট করে ধরলে আমি যাকে ভালোবাসি, কতটা অপমান তাকে লাঞ্ছিত করবে।

হায়! কত আমি তাকে ভালবাসি। ভগবান যেন তার সহায় হ'ন।

দয়াময়, তার বেদনাময় মুখের দিকে একবার চেয়ে দেখ, ক্ষমা কর তার পাপ।

আমরা কঁস্তের ঘরে প্রবেশ করলাম। ডাক্তারের মুখে চিন্তার লেশ মাত্র ছিল না।

—কি হুনোয়া, তোমার অসুখ করেছে ?

কঁস্ত তার দিকে চেয়ে হাসলো।

—আমার তো তাই মনে হয়।

—দেখি হাতটা।

ডাক্তার হুনোয়াকে মন দিয়ে দেখছিলেন।

—কোন কষ্ট হচ্ছে ?

—হ্যাঁ, এখানে—কঁস্ত কপালের উপর হাত দিল।

—হুঃ বুঝেছি, ও কিছু নয়, শীঘ্রই ভালো হ'য়ে যাবে।

তিনি মিষ্টি সুরে তাকে আরও দু-একটা প্রশ্ন করলেন। তার পর তিনি বেরিয়ে গেলেন এবং আমায় ইশারা ক'রে ডাকলেন।

—কঁস্তের ভীষণ অসুখ, পাগল হ'য়ে গেছে। তার উপর একটু নজর রাখো, যা'তে ঘুমোয় তার চেষ্টা করো। এ ঘটনার কথা ওকে কিছু বোলো না। এখন তার মামা কোথায় জানো ?

কলোনেল দেসক্লের স্পেনের ঠিকানা তাঁকে দিলাম।

—আমি তাকে এখুনি একটা টেলিগ্রাম করছি। তার এখন আসা প্রয়োজন। কিন্তু মারগেরীৎ নিজের দিকে চাও, তা না হ'লে তোমারও অসুখ করবে।

ডাক্তার চলে গেলেন, আমি ঘরে ঢুকলাম। হুনোয়া বিছানায় শুয়ে আছে অজ্ঞানের মত। আমি তার মা'কে ইঙ্গিত করতে তিনি ঘর থেকে বেরিয়ে এলেন। আমি তাঁকে সব বল্লাম তিনি নীরবে কাঁদতে লাগলেন। তারপর আমরা আবার ঘরে প্রবেশ করলাম ; কঁস্ত নিদ্রা যাচ্ছিলেন। তার মুখমণ্ডল ফ্যাকাশে ও মরার মত। হঠাৎ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো তার দু'চোখ।

—আগুন! আগুন! আমায় পাগল করে দিলে…পুড়িয়ে মারলে আগুন! আগুন—কঁস্ত বিড়বিড় করে বলতে লাগলো।

আমি আমার রুমালখানি জলে ভিজিয়ে তার কপালের উপর রাখলাম। সে আমার হাত দুটো চেপে ধরলে খুব জোরে। আমার মা ও বাবা এলেন; আমি নীচে নামলাম। তাঁরা আমায় সঙ্গে করে নিয়ে যেতে চাইলেন। আমি তাঁদের অনুরোধ করলাম থাকবার জন্যে অনুমতি দিতে। শেষ পর্যন্ত আমার অনুরোধই বজায় রইলো। মা'র ইচ্ছে, আমার কাছে কাছে থাকেন কিন্তু আমি তাকে শেষ পর্যন্ত বিরত করলাম

১৭ই জানুয়ারী

কঁস্ত এখনও পীড়িত। প্রায় দু'সপ্তাহ হ'লো তার জ্বর হচ্ছে এবং ভুল বকছে, কিছুই সে বুঝতে পারছে না বা অনুভব করতে পারছে না। রাত্রে একটু ঘুমোয় না। হে ভগবান, কত কষ্ট পাচ্ছে সে! মঙ্গলময় আমাদের উপর করুণা কর। অনেক বোঝানোর পর তার মা বিশ্রাম করতে রাজী হ'য়েছেন। এখন আমরা পালা করে রোগীর বিছানায় জেগে বসে থাকি। ১৯ তারিখে সকালে কলোনেল এলেন। আমি তাঁর কাছে এগিয়ে আসতে তিনি আমার হাত দুটী ধরে আমায় আদর করলেন। আমি তাকে ঘটনার আগাগোড়া বললাম।

—হতভাগা ছেলে, এখন কি হ'বে ওর। তার পর রাগতভাবে চিৎকার করে উঠলেন

—না, ওর বিচার হ'তে দেওয়া হ'বে না; ওকে চলে যেতে হ'বে।

আমি বিমর্ষ মনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলাম। ক্রমে তিনি শান্ত হ'য়ে আমার পানে চাইলেন, তারপর আমার হাত দুটী তাঁর হাতের মধ্যে নিলেন।

—তুই ওকে এখনও ভালোবাসিস ?

আমি চোখ তুলে তাঁর দিকে চাইলাম কোন উত্তর দিলাম না। তিনি আমার চোখের ভিতর পেলেন তাঁর প্রশ্নের উত্তর।

—হায়রে হতভাগী! বড় বড় দু'ফোটা জল তাঁর চোখ থেকে ঝরে গড়িয়ে পড়লো তাঁর গোঁফের উপর দিয়ে

১৮ই জানুয়ারী

কাল দুনোয়া অনেকটা শান্ত হ'য়ে রাত কাটিয়েছে। সে ঘুমোতে পেরেছিল। ভোরবেলা, তিনটার সময়, আমি তার বিছানার কাছে নতজানু হ'য়ে বসেছিলাম সেই সময় সে আমার কাঁধের উপর হাত রাখলে। তাব বিছানার উপর অর্ধশায়িত ভাবে বসে জানলার দিকে আঙ্গুল দেখিয়ে অতি মৃদু স্বরে বললে :

—যেশু হ'চ্ছেন তিনিই, যিনি মরে গেছেন ; ভগবান তাঁকে নির্মল করে আপনার পাশে বসিয়ে রেখেছেন এবং তিনিই ভগবানের কাছে আমাদের জন্যে প্রার্থনা করছেন।

শেষ কথাগুলি সে ধীরে ধীবে বললে। অধরের উপর তার আনন্দের হাসি। আমি কথা বলতে যাচ্ছিলাম সে আমায় বল্লে :

—চুপ! শোনো!

সে যেন কি দেখছে, স্থীর দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে—কি যেন শুনছে! আকাশে চাঁদ ও তারা মৃদু আলো দিচ্ছে। এমনি করে পনের মিনিট কেটে গেল তারপর রোগী আবার বিছানার উপর শুয়ে পড়লো।

—শেষ হ'য়ে গেল,—সে দুঃখিত ভাবে বললে।

সে চোখ বুজে আবার ঘুমিয়ে পড়লো। ভগবান নিশ্চয়ই তার উৎকণ্ঠা ক্ষমা করবেন। এমন কে আছে যে পাপ করেনি! আমরা মেষ সাবকের মত সকলেই বিপথে চলেছি, আমাদের পথ থেকে সকলেই তো বিচ্ছিন্ন হ'য়ে পড়েছি। আর ভগবান তো আমাদের সকলের ভাবনা নিজে ভাবছেন: "আমার ভাবনা, তোমরা ভাবো, আমি তোমাদের ভাবনা ভাববো, তোমাদের পাপের কথা আমার আর মনে থাকবে না"। মঙ্গলময় তাকে ক্ষমা কর। তোমার অগাধ করুণা তা'র উপর বর্ষণ করো, সে যেন তোমার বুকে শান্তি পায়।

সকাল বেলা ডাক্তার এলেন। কণ্ঠের অবস্থা দেখে তিনি বিশেষ আনন্দিত হ'লেন। ভুলবকা একটু কমেছে কিন্তু মস্তিষ্ক এখনও দুর্বল।

২০এ জানুয়ারী

আজ সকালে আমি তার বিছানার কাছে বসে পড়ছিলাম। সে চোখ বুজে ছিল। আমি ভেবেছিলাম সে ঘুমোচ্ছে কিন্তু তার দিকে চেয়ে দেখলাম, সে আমার পানে চেয়ে রয়েছে। সে আমায় ইশারা করলে কাছে আসবার জন্যে।

—ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখছিলাম,—সে আমায় বললে, গাস্ত কোথায়? সে তো আমার সঙ্গে দেখা করতে এলোনা।

আমি চুপ করে রইলাম।

—এখনও কি আমার উপর তার রাগ আছে। তাকে আসতে বল—যাও। আমি বেরিয়ে গেলাম। মঃ দেসক্রে উপরে উঠছিলেন—আমি তাঁকে সব বললাম এবং আরো বললাম—

—কঁস্তকে সত্যি কথাই বলুন।

আমাদের দেখতে পেয়ে দ্রুনোয়া বললে :

—ওর বুঝি আমার সঙ্গে দেখা করতে ইচ্ছে নেই ?

—সে আসতে পারবে না—তার মামা বললেন।

—কেন ?

—সে মারা গেছে।

—তা হ'লে আমাব স্বপ্ন সত্যি !

সে তার মামার দিকে ঝুকে পড়ে বললে।

—আমি দেখলাম সে মরে গেছে—হ্রদের ধারে, আর তার চোখ দুটো! ওঃ সে কি ভয়ঙ্কর চোখ! ভগবান।—সম্পূর্ণ বিস্ফারিত। আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম, তার মরা অধরের অন্তরাল থেকে বা'র হলো—'কাইন'—সে চিৎকাব করে উঠলো কর্কশ তার স্বব। সত্যি! এ কি সত্যি!

মনে হল তার শূন্য দৃষ্টি তার মামাকে গিলে ফেলতে চায়।

—হ্যাঁ…

—হায় ভগবান !

কী ভয়ঙ্কর চিৎকার ! সে মৃতপ্রায় হ'য়ে বিছানার উপর শুয়ে পড়লো। তার মামা তার মুখের উপর আঁজলা করে জল ছিটিয়ে দিতে সে চোখ খুললো, সঙ্গে সঙ্গে বন্ধ করলো। কলোনেল আমায় তার বিছানার কাছে থাকতে বললেন ; তিনি গেলেন ডাক্তার ডাকতে। আমি সেখানে রইলাম। কয়েক মিনিট পরে সে আবার চোখ খুললো, শূন্য দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ সে আমার পানে চেয়ে রইলো। হঠাৎ তার ভ্রূযুগল কুঞ্চিত হলো—যেন তার চোখে ভীতিপূর্ণ বিদ্যুত খেলে গেল। দ্রুনোয়া আমার হাত চেপে ধরে, কর্কশ, অথচ অতি নীচু গলায় আমায় বললে :

—সত্যি !···সত্যি ! আমি···আমি একাজ করেছি ? কে বললো আমায় সে কথা ··?

আমি কোন উত্তর দিলাম না।

—কথা কও—তুমি তো কখনও মিথ্যা কথা বলো না।

—সত্যি, তুমি যা বলছো তা সত্যি।

চারদিক কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ ! আমরা নির্বাক হয়ে পরস্পরের দিকে চেয়ে রইলাম—যেন মর্মর-মূর্তির মত। প্রায় পনের মিনিট এমনি ভাবে কেটে গেল, ডাক্তার প্রবেশ করলেন।

—কি, তুমি স্বপ্ন দেখছো না কি ? তিনি উৎফুল্ল ভাবে বললেন।

দ্রুনোয়ার যেন চমক ভাঙ্গলো।

—ঠাট্টা নয় ডাক্তার ! আমি সব জানি।

কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর আবার বললে :

—ভগবান ! নিজের নির্দোষ সহোদরের রক্ত দেখবার পূর্বে আমার মৃত্যু হলোনা কেন !

সে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগলো নিজের দুহাতের মধ্যে মাথা রেখে। ডাক্তার ও কলোনেল পাশের ঘরে গেলেন। আমি তার কাছে এগিয়ে গেলাম, আপনা থাকতেই আমার হাত দুটো তার চুলের মধ্যে সঞ্চালিত হ'তে লাগলো। হে ভগবান কি ভীষণ বেদনা তার। সে ক্রমশ শান্ত হয়ে একটু সরে বসলো।

—একবার ভাবো আমি কে—ভ্রাতৃহন্তা ! সে বললে বেদনাপূর্ণ কণ্ঠে।

আমার মনে ভীষণ কষ্ট হলো।

—কিন্তু আমরা কি সেই মঙ্গলময়ের সন্তান নই ?

—হ্যাঁ, আগে তুমি আমায় ভালোবাসতে ; মা আমায় সে কথা বলেছেন। তুমি কি এখনও আমায় ভালোবাসো ?

—'আমেন' '—সে বললে।

তার হাতের ভিতর আমার হাত নিয়ে কিছুক্ষণ পরে বললে।

—ভগবান কি আমায় ক্ষমা করবেন, তাঁর উপর তো আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।

ডাক্তার ঘরে ঢুকলেন।

—এখন তোমার শরীরের ও মনের বিশ্রাম চাই। দ্যুনোয়া তাকে আর কিছু বলতে দিলে না।

—আমার মনে হ'চ্ছে আমি সম্পূর্ণ সুস্থ ম'সিয়ে সাঁস্তো। আইন নিজের পথে চলুক। সব কিছুই আইন অনুযায়ী হওয়া চাই। বিচারের দিন ক'বে ধার্য হ'য়েছে?

—বাইশে তারিখে।

—আজ কত তারিখ···?

—বিশে।

—তা হ'লে পরশু?

—হঁ্যা।

—বেশ।

সারা দিনের এত ঘটনা সত্ত্বেও সে চার ঘণ্টা ঘুমালো।

২১শে জানুয়ারী

আজ বিকেলে পিতা রোশেল এসেছিলেন রোগীকে দেখতে। ভক্ত জঁার (St. Jean) চতুর্দশ পরিচ্ছেদ পাঠ করার পর তিনি নতজানু হ'য়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলেন আমাদের পাপ ক্ষমা করবার জন্যে—এবং রোগীকে করুণা করতে।

—হে মঙ্গলময়, তুমি তো চাওনা পাপীর মৃত্যু—তুমি চাও সে অনুতাপ করুক। তার আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্যে তোমার ভৃত্যকে করুণা কর, সে তোমায় সর্বান্তকরণে ডাকছে, তাকে ক্ষমা করো।

সকলেরই চোখে জল। পুরহিত যখন উঠে দাঁড়ালেন দ্নোয়া মাথা নিচু করে বললে।

—আমায় আশীর্বাদ করুন পিতা।

মঃ রোশেল তার মাথার উপর হাত রেখে বল্লেন।

—তোমার বিপদে ভগবান সহায় হ'ক।

কঁস্ত তার মাকে আর আমায় সব কিছুই বললে। সে যখন তার গল্প আরম্ভ করলে আমি চলে যাচ্ছিলাম, কিন্তু তার মা আমায় থাকতে বললেন। তিনি আমার মুখের দিকে সকরুণ দৃষ্টিতে চেয়ে বললেন।

—মা ওকে যেতে দাও! যে ঘটনা আমি তোমায় বলবো তা ভীষণ দুঃখের। ওর তা না শোনাই ভালো।

কিন্তু তার মা আমায় যেতে দিলেন না।

—না দ্নোয়া ও থাক—হতভাগী তোকে বড ভালোবাসে।

—সব শুনলে ও আর আমায় ভালোবাসবে না—সব শুনলে ও কি ভাববে জানো? ...সে মৃদু স্বরে বললে। তারপর সে সব বললে।

—এই হ'লো কয়েকটী কথায় সমস্ত ঘটনার বিবরণ।

"আমি কোর‍্যানের ভালোবাসায় পাগল হয়ে ছিলাম—আর সে...দ্নোয়া—নিম্নস্বরে বললে—সেও তাকে ভালোবাসতো। আমি বারবার তাকে বলেছিলাম আমার পথ ছেড়ে দিতে কিন্তু সে আমার কথায় কান দিত না—আর কোর‍্যান আমার চেয়ে তাকে বেশী পছন্দ

করতো, কারণ আমার হাবভাব তার মতো মিষ্টি ছিল না। মেয়েটী আমায় ভয় করতো। তাকে আমি বলেছিলাম, বিয়ে করবো কিন্তু সে আমায় চাইতো না। তারপর হঠাৎ আমায় যেন কিসে পেয়ে বসলো—আমি যেন আর বেঁচে ছিলাম না, তারপর একদিন রাত্রে···আকাশে তখনও চাঁদের আলো, দেখলাম তারা বাগানের অলিতে ঘুরে বেড়াচ্ছে····আর আমার কিছু মনে নেই। বাকিটা আমি কিছু স্মরণ করতে পারছি না আমি কী ঘৃণ্য কাপুরুষ, আমি কেন আগে মারা গেলাম না!

সে তার হাতের মধ্যে মুখ লুকালো। তার মা কাঁদছিলেন। আমি উঠে দুনোয়ার হাত আমার হাতের মধ্যে নিলাম। প্রভুভক্ত কুকুরের প্রভুর নিরাশ অবস্থা দেখে যেমন অবস্থা হয় আমারও হলো ঠিক তাই, কেন তা জানি না। ঘরের সকল ঘটনাই আমি দেখছিলাম কিন্তু কোন কিছুই যেন আমি গ্রাহ্য করি না। যেন স্বপ্ন দেখছি। কিন্তু আমার রক্তহীন মুখমণ্ডল দেখে ভয় পেয়ে গেল। সে আমার মাথার চুলের মধ্যে তার অঙ্গুলী সঞ্চালন করতে লাগলো। সে মৃদুস্বরে বল্‌লে

---ভগবান! এও কি মরবে নাকি! মারগেরীৎ তোমার ঘরে যাও—সে বললে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকবার পর। শিশুর মত আমি তার কথা শুনলাম। আমি সিঁড়িতে উঠলাম মনে হলো সিঁড়ির যেন আর শেষ নেই। ঘরে প্রবেশ করে আমি একটা চেয়ারের উপর বসে পড়লাম। কতক্ষণ যে সেই চেয়ারের উপর বসেছিলাম তা জানি না। শেষ পর্যন্ত আমার ঘোর কেটে গেল, আমি উঠলাম—সারা শরীরে বিদ্যুতের মত তুষার শীতল কম্পন খেলে গেল; চেয়ে দেখলাম, জানলা খোলা এবং বাইরে তুষারপাত হয়েছে। আমি জানলা বন্ধ করে

দিলাম। ফিরে চাইতে আমার চোখ পড়লো ক্রোয়ার উপর, মনে হ'লো ঐ জিনিসটাই আমাকে স্বর্গীয় সান্ত্বনা দিতে পারবে। আমি সেই ক্রোয়ার নীচে নতজানু হ'য়ে বসে, জানি না, কি বললাম কিন্তু সর্বশক্তিমান আমার অন্তর দেখেছিলেন, তিনি আমায় সান্ত্বনা দিলেন। ত্নুনোয়ার সঙ্গে রয়েছে দেখলাম মঃ দেসক্লে। ত্নুনোয়া যেন একটু ভেঙ্গে পড়েছে বলে মনে হ'লো। আমায় দেখতে পেয়ে তার মুখ-মণ্ডল উজ্জ্বল হ'য়ে উঠলো। আনন্দে তিনি হাসলেন।

আজ বিচারের দিন। আমি গেলাম না, আমার যাবার ক্ষমতা ছিলনা। ত্নুনোয়া গাড়ী করে এজলাসে গেল। ডাক্তার তার সঙ্গে গেলেন, তার মামা ও তার মা'ও সঙ্গে ছিলেন। কয়েকজন পুলিসের কর্মচারী আসামীর সঙ্গে ছিলেন। তিনি সম্পূর্ণ মঙ্গলময় আমাদের করুণা করুন!

—বিকেলের কথা। তারা বিকেল ৫টার সময় ফিরে এলেন। সেও তাদের সঙ্গে ছিল। তার মামার অনুরোধে যারা তার পাহারায় ছিল তারা তাকে আসতে দিয়েছেন, আমাদের কাছ থেকে বিদায় নেবার জন্যে। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়েছিলাম, স্পন্দিত হৃদয়ে। ত্নুনোয়া আমার কাছে এগিয়ে এলো। সে মুখে হাসি ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করলো। আমার হাত তার হাতের মধ্যে নিয়ে বললে।

— পনের বছর সশ্রম কারাদণ্ড....

আমি কোন উত্তর দিলাম না। পনের বছর সশ্রম কারাদণ্ড! আত্মীয়-স্বজনের কাছ থেকে দূরে! এ মৃত্যু ছাড়া আর কি; একেতো তার শরীর ভেঙ্গে গেছে এ ঘটনার পর থেকে।

—ত্নুনোয়া! এ যে ভীষণ কঠিন শাস্তি!

—না! আমার তো মৃত্যুদণ্ড হাওয়া উচিত ছিল! রক্তের পরিবর্তে রক্ত!

—চল আমরা ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি,—মৃদু স্বরে বললাম। প্রাসাদের ছোট গির্জাটিতে আমি তার মা'কে দেখতে পেলাম। তিনি প্রসারিত হস্তে যেশুর প্রতিমূর্তির নিকট ধন্না দিয়ে পড়ে আছেন। প্রতিমূর্তির নীচে লেখা ছিল 'আমার কাছে এসো তোমরা, যা'রা পরিশ্রান্ত কর্মের বোঝা ব'য়ে, আমি তোমাদের বেদনা দূর করবো।

আমাদের জীবনের বোঝা অসহনীয় হ'য়ে পড়েছিল। আমরা তার মা'র কাছে নতজানু হ'য়ে বসলাম। তিনি কঁস্তের হাত নিজের হাতের মধ্যে ধরে রইলেন। আমরা একটি কথাও বললাম না। সর্বান্তকরণে আমরা ভগবানকে ডাকলাম। তারপর জুনোয়া উঠে নিম্ন স্বরে বললে :

—মা এ'বার আমায় ছেড়ে দাও।

তার মা দাঁড়িয়ে উঠে তাকে বুকে চেপে ধরলেন।

—না না, ওদের আমি হত্যা করতে দেব না আমার একমাত্র সন্তানকে—তিনি হতাশ ভাবে চিৎকার করে উঠলেন।

তিনি ভীতভাবে তার চারদিকে চাইলেন। কঁস্ত আস্তে আস্তে তার মায়ের কাঁধের উপর হাত রাখলো।

—পনের বৎসর সশ্রম কারাদণ্ড হ'য়েছে বই'তো নয় মা, ভগবানের কাছে আমার জন্যে প্রার্থনা কর—আস্তে আস্তে সে নিজেকে মায়ের আলিঙ্গন থেকে মুক্ত করে নিলে। তার মা, দেবতার বেদীর নিকট নতজানু হয়ে বসলেন। সে মার দিকে ঝুঁকে পড়ে বললে, মা আমায় আলিঙ্গন কর।

মা কাঁদতে কাঁদতে তার পুত্রের গলা জড়িয়ে ধরলেন। চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিলেন তা'কে।

—ভগবানের করুণার উপর তোকে ছেড়ে দিলাম—আবার তিনি ভগবানের নিকট নিজেকে সমর্পণ করলেন। তার পর তিনি আমার পানে চাইলেন।

—বিদায় মারগেরীৎ। আমার দিকে তার বড় বড় চোখ তুলে চেয়ে সে পুনরায় বললে।

—তোমার প্রার্থনার সময় আমায় মনে রেখ মারগেরীৎ—বিপথ-গামী ভাইয়ের মত···রাখবে তো ?

—রাখাবো। তার পর তার মাকে দেখিয়ে বললেন :

—মাকে মাঝে মাঝে দেখে যেও—উনিতো এখন একলা !

—দেখবো।

তিনি তার হাতের মধ্যে আমার হাত নিয়ে বললেন।

—ওঃ মারগেরীৎ—তুমি আমার অনেক কিছু করলে, ভগবান তোমায় পুরস্কৃত করবেন। এই কথা বলে সে চলে গেল।

ইচ্ছে হ'লো তার সঙ্গে যাই···কিন্তু আমার আর একটুও শক্তি ছিলনা। আমার বুকের ভিতরটা একেবারে খালি হ'য়ে গেলো। আমার চারদিকে যেন গাঢ় অন্ধকার ঘিরে রয়েছে—জীবনের প্রদীপ যেন নিভে গেছে। অন্ধকার ঘরের অন্তরালে শিশুর মত আমি ভীত হ'য়ে উঠলাম। আমি তার মাকে জড়িয়ে ধরলাম। ভগবান আমার সহায় হও আমার দয়া কর !

১৫ এপ্রিল ১৮৬১

অনেক দিন আমি দিনপঞ্জী লিখিনি। ভীষণ রোগ থেকে সবে উঠেছি। আমার ভীষণ জ্বর হ'য়েছিল সেই সঙ্গে বিকার। বাঁচবার

আশা ছিল না। কিন্তু ভগবান মঙ্গলময়। চোখ খুলে যখন দেখলাম—সূর্য, সুনীল আকাশ, আমার মাকে ও বাবাকে, ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম।

"তোমার করুণা সম্পূর্ণ ভাবে আমার উপর রয়েছে!" আগের জীবন মনে হ'লো একটা বেদনাময় স্বপনের মত—যেন প্রায় বিস্মৃত হ'য়ে এসেছে। সব মনে করবার চেষ্টা করলাম।...প্রায় পনের দিন পর যেন আজ আমি চোখ খুলেছি।

একদিন বিকালে দেখলাম, কতকগুলো লোক আমার ঘরে বসে চুপি চুপি কথা কইছে। আমি চোখ বুজে ছিলাম, চোখ মেলে চাইলাম কিসের শব্দ শুনে। দেখলাম, কে যেন ফুপিয়ে ফুপিয়ে কাঁদছে—আমার পাশে নত জানু হ'য়ে বসে দু'হাতের মধ্যে মুখ লুকিয়ে। আমি চোখ বুজলাম—চিন্‌তে পারলাম লুই লেফ্যাব্র-এর কুঞ্চিত কেশ। তাকে দেখে আমার হৃদয় এক অজানা বেদনায় ভরে উঠলো। সে আমায় ভালোবেসেছিল প্রথম দিন থেকে—কিন্তু পরিবর্তে আমি কি দিয়েছি তাকে? কেবল বেদনা। তার প্রতি আমার ভীষণ করুণা হ'লো...এইবার তো আমি মরবো—তার কাছ থেকে আমার ক্ষমা চাওয়া প্রয়োজন। হায়রে! যদি আমি তাকে আগে চিনতে পারতাম যদি আমি তার ভালোবাসা অগ্রাহ্য না করতাম! আমি আমার হাত তার অবনত মস্তকে রাখলাম।

—লুই, তুমি আমায় ক্ষমা করবে?

আমি ভীষণ দুর্বল হ'য়ে পড়েছিলাম—অনেক কষ্টে কথা বলছিলাম। সে আমার হাতখানি তার অধরের উপর রাখলে। তার দু'চোখে জল—এই হ'লো আমার প্রশ্নের উত্তর।

—লুই, আমি যখন আর থাকবোনা—তুমি ছেলের মত আমার মা-বাবাকে দেখবে তো?

আমার ধারণা হ'য়েছিল আমি মারা যা'বো—

—হতভাগী মা! তাঁদের দেখো—তাঁরা আমায় ভালোবাসেন, বড় বেশী ভালোবাসেন, আমি চলে গেলে আমার অভাবে তাঁরা যে কি করবেন সেই কথা ভেবে ভয় হয়।

সে উত্তর দিলনা—আমার দিকে অবর্ণনীয় বেদনাভরে চেয়ে রইলো, আমার হাত দুটী নিজের হাতের মধ্যে রেখে। আমার দুর্বল চোখ শ্রান্ত হ'য়ে বুজে এলো।

বুঝতে পারলাম কে আমায় আদর করে বলছে :

—হতভাগী মেয়ে আমার···

—বাবা!···

আর লিখতে পারছিনা।

তার পর আবার রোগের নতুন আক্রমণ শুরু হ'লো। আজ তিন দিন হ'লো আমি সম্পূর্ণ ভালো হ'য়ে উঠেছি—কেবল একটু দুর্বল। আমার ইচ্ছা অনুযায়ী আমায় সকলে একলা থাকতে দিয়েছে, আমার নিজের ঘরে। আমাকে ভালো হ'তে দেখে মা'য়ের আনন্দের সীমা নেই। সম্পূর্ণ ভাবে সুস্থ হ'য়ে উঠতে আমার এখনও অনেক দিন সময় লাগবে। আজই সকালে আমায় আলিঙ্গন করবার সময় মা আনন্দে কেঁদে ফেললেন।

—তোর গায়ে একটু রক্ত নেই—মারগো।

থেরেস সেখানে দাঁড়িয়েছিল, সে মা'কে বকতে লাগলো কিন্তু তার চোখে জল।

—ছোট মেয়েকে আনন্দ দেবার বেশ তো পন্থা তোমার মা—তুমি কাঁদছ, দেখ তো তোমার কান্না দেখে ও কাঁদছে—তার উপর আবার ডাক্তার বারণ করে গেছেন ও যেন কোন কারণে কষ্ট না পায়।

মা হাসছিলেন, এবং আমার গালে হাত বুলোচ্ছিলেন। থেরেস আবার আরম্ভ করলে :

—নেই বা রইলো ওর গালে রক্ত, তা বলে ওকে কি দেখতে কম সুন্দর। বরং ওকে দেখতে আরো ভালো হ'য়েছে, যে ওকে দেখবে সেই এ কথা বলবে। তুমি বাপু ওর পানে অমন করে চেওনা, আর দীর্ঘনিশ্বেসও ফেলোনা—ওতে ওর কষ্ট হ'বে। মঃ লে কাপিত্যান এলে আমাদের আর আনন্দের সীমা থাকবেনা।

বাবা এলেন। তিনি আমার বিছানার উপর বসে আমায় আদর করলেন। থেরেস বেরিয়ে গেল, মা বসে রইলেন কিন্তু আমি তাকে বিশ্রাম করবার জন্যে যেতে বললাম। বাবা আমার কথায় সায় দিলেন, শেষ পর্যন্ত তিনি কর্তৃত্বের সুরে তাকে যেতে হুকুম করলেন। শেষ পর্যন্ত তিনি গেলেন।

—মা আমার ভালো হ'য়ে উঠেছে—তিনি বললেন—ভগবানের দয়া যে আমাদের উপর রয়েছে।

—সত্যি বাবা…

কিছু পরে তিনি আবার বললেন :

—জানিস, লুই তোকে দেখতে এসেছিল ?

—জানি বাবা, সে সময় হয়তো আমি মরতে বসেছিলাম।

—সকলেই ভয় পেয়ে গিয়েছিলো, মা। আমার খুড়ীর কাছে তোর অবস্থার কথা শুনে ও পাগলের মত হ'য়ে গিয়েছিলো।

তার পর অনেকক্ষণ চুপ করে থেকে তিনি বললেন :

—এখন সে বাড়ীতে ফিরে গেছে—শীগ্‌গির আসবে তোর সঙ্গে দেখা করতে।

—কঁস্তেস কেমন আছে বাবা ?

—ভালো নেই, মাঝে মাঝে মাথা ঠিক থাকেনা।

—আর সে?

—সে মারা গেছে—আত্মহত্যা করেছে।

—হায় ভগবান! কথাটা বল্‌লাম অস্ফুট স্বরে।

তা হ'লে বিকারের ঘোরে সে নিজের দিন নিজে হাতে শেষ ক'রে ফেলেছে। তাকে গোরস্থানের বাইরে গোর দেওয়া হ'য়েছে তুল্ঁ'র কাছে। আমার ইচ্ছে হয় তার কাছে যাই।

২০এ এপ্রিল

কাল আমি অনেক কষ্টে শোবার ঘরে গেলাম। আমি নীচে নামতে চেষ্টা করলাম, কিন্তু কয়েক ধাপ নেমে বসে পড়তে হ'লো। বাবা চিৎকার করে উঠলেন।

—আমি যাচ্ছি—তোকে নিয়ে আসছি; তুই ভীষণ দুর্বল।

তিনি আমাকে দু'হাতে করে তুলে নিয়ে বসবার ঘরে সোফার উপর শুইয়ে দিলেন। মা গেলেন এক গ্লাস মদ নিয়ে আসতে। বাবা আমার কাছে বসলেন। আমি তাঁর কপালে হাত দিলাম—মনে হ'লো তাঁর কপালে আমার অসুখের জন্যে আরো রেখা পড়ে গেছে।

—বাবা, আমার অসুখের সময় তোমার খুব কষ্ট হ'য়েছে?

আনন্দে তিনি আমায় জড়িয়ে ধরলেন—তিনি যেন চান আমাকে মরণের হাত থেকে বাঁচিয়ে রাখতে—

—ভগবানের ইচ্ছে আমি তোমাদের কাছে থাকি—হয় তো তোমাদের প্রতি আমার সকল কর্তব্য শেষ হয় নি সে জন্যে দয়াময় আমায় সময় দিলেন সব কর্তব্য শেষ করতে।

তিনি আবার আমায় বুকে জড়িয়ে ধরলেন।

২১এ এপ্রিল

লুই কাল এসেছে। বাবা ও আমি বসবার ঘরে ছিলাম। ঘরের দরজা খুলে গেল। আদলফ্ তার সংবাদ আমাদের দেওয়ার আগেই সে ঘরে এসে ঢুকলো। বাবা আনন্দে তার সঙ্গে করমর্দন করলেন।

—আরে! একেবারে বোমার মত কোত্থেকে এসে পড়লে?

তিনি হাসতে হাসতে বললেন।

লুই আমার দিকে এলো।

—শুভাগমন হ'ক, আমি বললাম।

আমি বুঝতে পারলাম, আমায় দুর্বল ও রক্তহীন দেখে তার মনে আঘাত লেগেছে। বাবা, মা'র খোঁজে গেলেন! লুই আমার হাত তার হাতের মধ্যে নিয়ে আমার চুপসে যাওয়া আঙুলগুলি উল্‌টে পাল্‌টে দেখতে লাগলো।

—তুমি একেবারে রক্তহীন · ফ্যাকাশে হ'য়ে গেছ! সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়লো—এবং নীচু গলায় বললে—তোমার উপর দিয়ে ঝড় বয়ে গেছে।

সে আমার দিকে মাথা নোয়ালো; তার অধর আমার কপাল স্পর্শ ক'রলো; তারপর হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে অগ্নিকুণ্ডের দিকে গেল। আমার অবস্থা দেখে সে ভীষণ ভাবে আহত হ'য়েছিল। মনে কোন ঘা লাগলে, তার চোখ দু'টো যেন আরো কালো হ'য়ে ওঠে—আমি তার সেই চিন্তাযুক্ত চোখের দিকে চেয়ে রইলাম। বাবা ও মা ঘরে এলেন। মা লুইকে চুম্বন করলেন।

—মারগো অনেক বদলে গেছে—সে ভীষণ রক্তহীন হ'য়ে পড়েছে, নয় লুই? আমার মাথায় হাত বুলোতে বুলোতে তিনি বললেন।

—হ্যাঁ, কিন্তু বসন্তকাল এলেই আবার সবল হ'য়ে উঠবে।

—সত্যি ? তিনি দুঃখিতভাবে জিজ্ঞেস করলেন।

—নিশ্চয় !

সে হাসতে লাগলো। বাবা বললেন :

—তখন আমি ও লুই সপ্তাহখানেক ও'কে সবল করে তোলবার ভার নেব, কি বল লুই ?

তিনিও রসিকতায় যোগ দেবার চেষ্টা করলেন কিন্তু তার চোখ তখন অশ্রুপূর্ণ। বিকেলটা বেশ আমোদে কেটে গেল। লুই ও বাবা বসেছিলেন চিমনির এক একটা কোণে ; আমি আমার সোফার উপর শুয়েছিলাম—বাবার একখানি হাত আমার হাতের মধ্যে ধরে। মা আমাদের কাছে বসে লেস্ বুনছিলেন। দশটা বাজতে বাবা বললেন—এবার শোবার সময় হ'য়েছে। আমি উঠলাম।

—তুই তো একা একা উঠে যেতে পারবি না—মা বল্‌লেন।

—পারি কি না দেখতে পাবে মা—আমি হাসতে হাসতে বললাম। নেমেছি তো কেবল বাবার হাত ধরে। বাবা বল্‌লেন :

—না, না তা হ'বে না—নামা'র চেয়ে ওঠা অনেক কষ্টকর।

—একবার চেষ্টা করতে দাও বাবা।

দু'টা ধাপও উঠতে পারলাম না—দম নেবার জন্যে বসে পড়লাম। বাবা আমার কাছে এলেন।

—কি পাগলামী করিস ? আবার শরীর খারাপ হ'বে।

—না, না—আমি হাসবার চেষ্টা করে বললাম।

তখন আমি ভীষণ দুর্বল বোধ করছিলাম। লুই আমার কাছে এলো।

—ঠিক হ'য়েছে, লুই তোকে নিয়ে যা'বে তোর ঘরে—ও তোকে ফেলে দেবে না, তুই নিশ্চিন্ত থাকতে পারিস...দেখছিস না ওর গায়ে কি রকম জোর।

আগেই লুই আমায় দু'হাতে করে তুলে নিয়েছে।

—আমার কাঁধের উপর মাথা রাখো, সে চুপি চুপি আমায় বললে।

তার গলার স্বর আমার যেন অদ্ভুত বলে মনে হ'লো, আমি ক্লান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম, তার কাঁধে মাথা রাখলাম। কী ভয়ানক দুর্বল আমি! যখন আমি চোখ খুললাম তখন মা'কে ছাড়া আর কা'কেও দেখতে পেলাম না। মা আমার হাতের উপর হাত ঘষছেন এবং থেরেস আমার পোষাক খুলে নিচ্ছে।

—ঐ, ঐ জ্ঞান হ'য়েছে—সে চিৎকার করে উঠলো।

—বাবাঃ···যা ভয় আমাদের লাগিয়ে দিয়ে ছিলি!

বুঝতে পারলাম, আমার চুপ-চাপ পড়ে থাকা ছাড়া কোন উপায় নেই।

—যাই আমি কর্তাকে বলিগে, তিনি কোথায় মা? আমায় একটা গরম পোষাক পরিয়ে দিয়ে থেরেস চলে গেল। আমি বললাম, —কে যেন বাগানে বেড়াচ্ছেন···ঐ যে! আমি আঙ্গুল দিয়ে দেখালাম।

—ওঃ···উনি! উনি কাপিত্যান। থেরেস এই কথা বলে চলে গেল।

বাবা কিছুক্ষণ পরে এলেন।

—বুঝতে পারলি তো মারগো, তুই এখনও ভীষণ দুর্বল।

—হ্যাঁ বাবা। কিন্তু, সকালে তো কেবল তোমার হাত ধরে নেমে গেলাম, সেই জন্যে ভেবেছিলাম উঠতে পারবো।

তিনি জানলা দিয়ে বাইরের দিকে চাইলেন।

—ঐ দেখ, লুই ঠিক যেন পাহারাওয়ালার মত চলে বেড়াচ্ছে। তোকে মূর্চ্ছা যেতে দেখে সে ভীষণ ভয় পেয়ে গেস্‌লো, ও তোকে বড় ভালোবাসে।

তিনি আমায় আদর করলেন।

—তোর কিছু চাইনা?

—কিছু না বাবা। তুমি শোওগে—মা তুমিও শুতে যাও তোমাদের কি কষ্টই দিলাম।

তাঁরা বেরিয়ে গেলেন আবার আমায় আদর করে।

২২এ এপ্রিল

আমি মা'র সঙ্গে বাগানে বসেছিলাম। বাবা আর লুই দ্রুতবেগে দূরে যাচ্ছিলেন, আমরা সেই দিকে চেয়েছিলাম। বাবা তার নিজের ঘোড়ায় চড়েছিলেন লুই চড়েছিলেন আমার ঘোড়ায়। আমি তাকে আমার ঘোড়ায় চড়তে মানা করেছিলাম কারণ অনেকদিন অস্ত্রেলিজ-এর উপর চড়া হয়নি বলে সে বেয়াড়া হ'য়ে গেস্‌লো। কিন্তু লুই আমার কথা শুনলে না। সে বললে, তাকে আবার বশে আনবে যা'তে আমার গায়ে জোর হ'লে আবার আমি ঘোড়ায় চড়তে পারি। তারা দ্রুতবেগে এগিয়ে চললো—ক্রমশঃ তারা দিগন্তে মিলিয়ে গেল।

মা বললেন:

—লুই কিছুদিন এখানে থাকবে। সে চার মাস ছুটি নিয়েছে। তাকে আমাদের কাছে পেয়ে আমার ভারি আনন্দ। সে বাড়ীটাকে আনন্দপূর্ণ করে রাখে। এখন তুই রোগ থেকে উঠছিস—এখন তোর আনন্দের দরকার।

—তিনি বড় ভালো—আমি বললাম।

আমার মনে পড়লো, গেল বছরের কথা—সে একটী কথাও বলেনি, যখন আমি তার প্রেম প্রত্যাখ্যান করেছিলাম। সে কত চেষ্টা করেছিল, তার সরল হাবভাবে, তার প্রফুল্ল আচরণের দ্বারা আমি যা'তে অতীতকে ভুলে যেতে পারি। মা একটী দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

—তোর বাবা ওকে ছেলের মত ভালোবাসে—তার বড় আনন্দ হ'তো লুই আমাদের জামাই হ'লে...

আমি মুখ ফিরিয়ে নিলাম কারণ আমি বুঝতে পারলাম চোখ আমার জলে ভরে আসছে। আমার বাবা মা চান লুইকে স্বামী-রূপে গ্রহণ করি—আমারও হয়তো কর্তব্য তাদের ইচ্ছা পূর্ণ করা। আমি ভয়ানক নিষ্ঠুর মেয়ে ছিলাম। ভগবান হয় তো আমার স্বভাব সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করে দিয়েছেন। এখন হয় তো আমি আমার ইচ্ছাকে দমন করে রাখতে পারবো। আমার নিষ্ঠুরতার জন্যে তারা কষ্ট পেয়েছেন···এখন আমি হয়তো তার প্রতিকার করতে পারবো। বাবা মা'য়ের ইচ্ছা পূরণ করবার চেষ্টা করা এখন আমার প্রয়োজন। আর লুই—তাকে তো আমি চিরকালই ভালোবাসি, ভগবান হয়তো এখন আমায় সাহায্য করবেন যা'তে তাকে আমি আরোও বেশী করে ভালোবাসতে পারি। ভগবানই আমায় পথ দেখাবেন।

২৮শে এপ্রিল

লুই আমাকে ভালোবাসে। তাকে কথা দিয়েছি তা'র স্ত্রী হ'বো, কাল সে-কথা তাকে বললাম। আমি সোফায় বসে ছিলাম দরজার

দিকে পিছন ফিরে। কে যেন ঘরে ঢুকলো শুনতে পেলাম। লুই আমার পাশে এসে বসলো। তাকে একটু চিন্তিত বলে মনে হ'লো। যখন সে আমার দিকে তার কালো চোখ তুলে চাইলো তখন মনে হ'লো তার দৃষ্টি আমার অন্তর ভেদ করলো। আমরা কোন কথা কইলাম না। বাইরেও কোন শব্দ ছিলনা। প্রকৃতির নিস্তব্ধতা যেন আমাদের বুকে এসে পৌঁচেছে বলে মনে হ'লো। তা'র হাত আমার হাত স্পর্শ করলো। আমি বুঝতে পেরেছিলাম সে কি বলবে। সে বললে :

—মারগেরীৎ আমি তোমায় ভালোবাসি। আমি আমার জীবন তোমায় সমর্পণ করেছি। তুমি আমার স্ত্রী হও। আমায় সুখী করো। আমার ভালোবাসাকে প্রত্যাখ্যান কোরোনা। বলো, আমার স্ত্রী হ'বে?

তার গলার স্বর বেদনাপূর্ণ—তার হাত আমার হাতকে জোরে চেপে ধরলো। তার মুখমণ্ডল রক্তহীন। সে তার দৃষ্টি দিয়ে আমায় আবরিত করে রেখেছিল। আমি ধীরে ধীরে তার কাঁধের উপর আমার হাত রেখে—তার স্ফটিকের ন্যায় চোখের দিকে চেয়ে যেন তার অন্তরের কথা স্পষ্ট করে দেখতে পেলাম। আমি বল্‌লাম :

—হ্যাঁ, লুই, আমি তোমার স্ত্রী হ'বো। মনে হ'লো তার শরীরের সমস্ত রক্ত তার মুখমণ্ডলে সঞ্চিত হ'লো। সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে তার উত্তপ্ত অধর আমার অধরের উপর রাখলে, বহুক্ষণ ধরে, সোহাগ করে, গভীর ভাবে।

—ভগবান! কত ভালোবাসি আমি তোমায়।

সে আমায় তার বুকের উপর চেপে ধরলে। তার ভালোবাসায় ভরা বুকের উপর যখন আমি আমার মাথা রাখলাম, আমার সারা শরীর ভরে উঠলো এক অবর্ণনীয় আনন্দে। একদিন চাষাদের একটা ছোট ছেলেকে বাঁচাতে গিয়ে আমি জলে ডুবে যাচ্ছিলাম।

বাবা জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে আমায় দু-হাতে জড়িয়ে ধরে জল থেকে তুললেন। সে দিনের অনুভূতি ছিল ঠিক আজকের অনুভূতির মত। ঘরের অন্ধকারে আর কিছু দেখা যাচ্ছিলনা। গাছের লম্বা লম্বা ছায়াগুলো ঘাসের উপর দুলছিল। কিছুক্ষণ আমরা চুপ চাপ রইলাম। তার পর আমি চোখ তুলে চাইলাম—তার দীপ্ত দৃষ্টির সঙ্গে আমার দৃষ্টি মিলিত হ'লো। আমি তার হাতখানি আমার হাতের মধ্যে নিয়ে তার কপালে চুম্বন করলাম।

—প্রিয় লুই, সত্যিই কি তুমি চাও আমি তোমার স্ত্রী হই? আমার চোখে জল এসে গেলো। উত্তরের পরিবর্তে সে তার বুকের উপর আমায় জোর করে চেপে ধরলে।

—আর তুমি কি চাও, আমার কাছ থেকে, লুই? পূর্বের মারগেরীতের ছাই তো মাত্র পড়ে আছে এখন...

আমি আমার শীর্ণ বাহুর দিকে চেয়ে বেদনার হাসি হাসলাম।

বাবা এসে পড়লেন। আমার কথার উত্তর দেবার সময় সে পেলোনা। লুই আমার হাত ধরে উঠে দাঁড়ালো।

—মারগেরাৎ আমায় কথা দিয়েছে আমার স্ত্রী হ'বে। আমাদের আশীর্বাদ করুন বাবা।

বাবা আমার কাছে এলেন।

—ভগবান আশীর্বাদ করুন—তোকে আর আজ যা'কে তুই গ্রহণ করে নিলি। আমাকে তুই আজ সত্যিই সুখী করলি। এই কথা বলে বাবা আমায় আদর করলেন।

—তোমার আনন্দ হ'য়েছে বাবা লুইকে কথা দিয়েছি বলে'...?

—হাঁ, মা হ্যাঁ...

তিনি গেলেন আমার মা'র খোঁজে। মা' এলেন। আমায় আদর করে জিজ্ঞেস করলেন :

—হ্যারে মারগো—সত্যি ?

—হ্যাঁ, মা।

—তা হ'লে ভগবান আমার কথা শুনেছেন।

তাঁরা সুখী হ'য়েছেন—আমার মনেও কম আনন্দ হয় নি, ভগবান সত্যিই মঙ্গলময়। লুই বাগানে এলো। আমরা তাকে দেখতে পেলাম সিগারের ধুম পান করতে করতে সে একটি ঘেরা জায়গায় পায়চারি করছে। বাবা আমার হাত ধরলেন।

—হ্যারে খুকী! তুই খুশী তো ?

—হ্যাঁ বাবা···

আমি বাবাকে জড়িয়ে ধরলাম।

—বেশ বেশ! তোর মুখ রক্তহীন দেখে আমার বড় কষ্ট হ'চ্ছিলো। যা'ক, এখন তোর মনে যখন আশা জেগেছে, তুই যখন ভালোবেসেছিস—তখন তোর সেরে উঠতে আর বেশী দেরী হ'বে না। তুই আর ঐ ছেলেটী···তোরা পরস্পরের জন্যেই তৈরী হ'য়েছিলি। নয় মারগেরীৎ!

—সত্যি; এখন ওদের একটু একা একা ছেড়ে দাও—কত কথা ওদের রয়েছে,—মা বাবাকে বললেন।

—সত্যি! লুই আমাদের মনে মনে খুব গালাগাল দিচ্ছে নিশ্চয়··· অনেক কথা বলবার আছে নয় খুকী ?

তারপর তিনি আমায় আদর করে বা'র হ'য়ে গেলেন—মা গেলেন তার সঙ্গে সঙ্গে। আমি একটী বেদীর উপর শুয়ে ছিলাম। লুই পায়চারি করছিল, আমি তাকে দেখছিলাম। কিছুক্ষণ পরে আর

কোন গলার আওয়াজ না পেয়ে, সে মাথা তুলে চাইলো—দেখলে ঘরখানা খালি। সিগার ফেলে রেখে সে এলো আমার কাছে বসবার জন্যে। সে আমার হাত তার হাতের মধ্যে নিলে। আমি যেন স্বপ্ন দেখছিলাম, আমি ভাবছিলাম আমার প্রতি তা'র গভীর ও অচঞ্চল ভালোবাসার কথা। সে জিজ্ঞেস করলে :

—তা হ'লে কবে ?

—কি ?

—বিয়ে ! সে হাসতে হাসতে বললে।

—ও ! তা তুমি দিন ঠিক করো।

—এখুনি ! সে হাসতে হাসতে বললে। ১৩ই যে দিন স্থির হোক, তা হ'লে ?

—বেশ।

—পনের দিনের মধ্যে তা হ'লে আমাদের বিয়ে হ'বে—কিন্তু এতদিন অপেক্ষা করতে হ'বে ! আমার ইচ্ছে আরো তাড়াতাড়ি হ'লে ভালো হোতো—তোমায় আপন করে পেতাম !

—যে দিন থেকে তোমার স্ত্রী হ'বো বলে কথা দিয়েছি—সেদিন থেকে তো আমি তোমারই হ'য়ে গেছি।

আমার কথায় তা'র আনন্দ হ'লো— সে হেসে আমার কপালে চুম্বন করলে !

—আমার ইচ্ছা তোমায় কোন গরম দেশে নিয়ে যাই এই দুর্দান্ত শীতের দেশ থেকে অনেক দূরে—যেখানে চিরবসন্ত—সেখানে তুমি আবার তোমার হারিয়ে যাওয়া রঙ্ ফিরে পাবে।

তার মিষ্টি কথায় আমার চোখে জল এলো। এখনো আমি দুর্বল—একটুতে আমি বিচলিত হ'য়ে পড়ি। তার কপালের উপর খসে পড়া

শিশুর কুঞ্চিত কেশের মত কেশ সরিয়ে দিতে দিতে আমি তার মুখের পানে চেয়ে রইলাম।

—তুমি আমায় কি মনে করো বলতো? সে জিজ্ঞেস করলে।

—তুমি কত ভালো, আমার উপরে তুমি কত সদয়। আমার চোখ থেকে দু'ফোঁটা জল গড়িয়ে ঝরে পড়লো তার হাতের উপর। আনন্দে ও তার উপর কৃতজ্ঞতায় উছল হ'লো আমার হৃদয় যখন সযতনে সে টেনে নিলে আমার মাথাটী তার বুকের উপর। আমার হৃদয় যেন আশ্রয় খুঁজে পেলো।

৫ই মে

আজ বিকেলে আমি কঁস্তের মা'কে দেখতে গিয়েছিলাম। তিনি পাগল হ'য়ে গেছেন, ভালোই হ'য়তো হ'য়েছে তা না হ'লে তাঁর বড় কষ্ট হ'তো। কলোনেল তাব কাছে থাকেন। আমায় দেখে কঁস্তেস এগিয়ে এলেন। তিনি আমায় আদর করলেন।

—তুই যে রোগা হ'য়ে গেছিস বাছা।

তার মিষ্টি গলার স্বরে আমি ভীষণ বিচলিত হ'যে পডলাম। বসে পড়ে কাঁদতে ইচ্ছে হোলো।

—তোর অসুখ করেছিল?

—হ্যাঁ।

তোকে টাটকা গোলাপের মত না দেখলে দুনোয়ার ভারী দুঃখ হ'বে। দু'এক দিনের জন্যে তো সে গেছে, কয়েকটা দরকারী কাজ আছে তাই…সে কোথায় গেছে রে?…হ্যাঁ হাঁ। মনে পড়ছে…তুলঁ"য়। বড় বিচ্ছিরি দেশ, নাম শুনলেও ভয় করে, কেন তা জানিনা, কিন্তু ভয় করে। দুনোয়া চলে যাওয়ার পর থেকে আমি যেন ভীতু হ'য়ে

পড়েছি। গাস্ত আসে মাঝে মাঝে আমার সঙ্গে দেখা করতে। রাত্রে ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে তাকে ডাকি, সে আসে আমার কাছে।

তার কথা শুনে দুঃখে আমার মন ভরে উঠলো। কলোনেল দেস্‌ক্রে এই সময় ঘরে ঢুকলেন। তিনি যেন আমায় দেখে একটু অবাক হ'য়ে গেলেন। করমর্দন করে আমার কপালে চুম্বন দিলেন। তার পর তার বোনকে জিজ্ঞেস করলেন :

—কেমন আছ ? এই কথা বলে তিনি তার পাশে বসলেন।

কঁন্তেস কোন উত্তর দিলেন না, তিনি যেন স্বপ্নবিভোর হ'য়ে আমার দিকে চেয়েছিলেন—কিন্তু যেন আমায় দেখছেন না বলে মনে হ'লো। হঠাৎ তিনি বল্‌লেন

—তুই তো হাসছিস না খুকী ! অমন মন-মরা হ'য়ে বসে আছিস কেন ? কি হ'য়েছে তোর ?

—কিছু হয় নি, এই কথা বলে হাসতে চেষ্টা করলাম কিন্তু অন্তঃকরণ বেদনায় ফুলে উঠলো।

—তোর মনের আনন্দ কেমন করে হারালি ?— কেন তা আমি জানি, কিন্তু সে তো ফিরে আসবে—ভাবনা কিসের। মন-মরা হ'য়ে থাকিসনে, ফিরিয়ে আন তোর রং···আমি তো তোর মা···আমার তো দুঃখ নেই। সে তো ফিরে আসবে।

আমি উঠলাম যা'বার জন্যে। তিনি আবার আমায় চুম্বন করলেন। নীচে নেমে আমি কলোনেলের করমর্দন করলাম। হঠাৎ তিনি আমায় বললেন :

—মারগেরীৎ, শুনছি তুই বিয়ে করবি ?—কথাটা কি সত্যি ?

—হ্যাঁ।

— কাপিত্যান লেফ্যাত্র-এর সঙ্গে তোর বিয়ে, নয় ?

—হ্যাঁ। তিনি আমার মুখ তুলে ধরলেন। তার হঠাৎ এ-প্রশ্নে আমার ভীষণ দুঃখ হ'লো—মাথা নীচু করলাম পাছে তিনি আমার জলভরা চোখ দেখতে পান এই আশঙ্কায়।

—হতভাগী—কলোনেল কম্পিত কণ্ঠে বললেন।

তিনি চুপ চাপ বাইরের ফটক পর্যন্ত আমার সঙ্গে এলেন। যখন গেট খুলে গেল তখন তিনি স্বপ্নোত্থিতের ন্যায় বললেন :

—তুই একলা এসেছিলি ?

—না, লুই কাছেই আছে—

তিনি আমার সঙ্গে লুইএর কাছ পর্যন্ত এলেন। লুই আমাদের কাছে এগিয়ে এলো। তারা পরস্পরের করমর্দন করলে। লুই আমার পাশে এসে দাঁড়ালো এবং আমায় বললে :

—তুমি শ্রান্ত হ'য়ে পড়নি ?

—না, এসো এখানে একটু বসা যাক। হাওয়াটা এখানকার ভারী ভালো লাগছে।

তার ভয় হ'চ্ছিল আমি বেশী পরিশ্রম করলে আমার শক্তিতে কুলিয়ে উঠবেনা। একটা ওক গাছের ছায়ায় আমরা বসলাম। কলোনেল আমার কাছে বসলেন। তিনি বললেন ;

—তোকে এখনও বিশেষ দুর্বল দেখছি

লুই উত্তর দিলে :

—ওর যে ভীষণ অসুখ করেছিল।

—তা আমি জানি।

লুই আমার দিকে চেয়ে হাসছিল—আশায় ভরা তার হৃদয়। সে আমায় এত ভালোবাসে! আমি কি তার প্রেমের যোগ্য হ'তে পারবো।

কলোনেল উত্তর দিলেন না, লুই তা' লক্ষ্যও করলে না। সে হাস্যমুখে কি চিন্তা করতে লাগলো—সম্ভবত আমাদের আগত-প্রায় বিয়েব কথা। কিছুক্ষণ বিশ্রামের পর আমরা উঠে পড়লাম "যা'বার সময় হ'য়েছে বলে"। কলোনেল আমায় আদর করলেন। তা'র খুর আনন্দ হয়েছিল।

—আমাদের প্রতি যে করুণা তুই করেছিস সে জন্যে ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন—

তাব পব লুই-এর করমর্দন করে তিনি বললেন।

—ও'কে সুখী কোরো। এ-রকম মেয়ে সাধারণত দেখা যায় না; ভগবানের আশীর্বাদে তুমি এমন মেয়ে খুঁজে পেয়েছো। তুমি ওকে ভালোবাসো তা আমি দেখতেই পাচ্ছি—এবং আরো বুঝতে পারছি যে তুমি বড ভালো ছেলে! হয়তো আমাদের আর দেখা হ'বে না কিন্তু এটুকু তোমরা নিশ্চয় জেনো এক জন বৃদ্ধ সৈনিকের আশীর্বাদ সর্বদাই তোমাদের দুজনের উপর থাকবে।

এই কথা বলে তিনি চলে গেলেন। আমবা বাড়ী ফিরলাম। প্রায় অন্ধকার হ'য়ে এসেছিল। বাবা আমাদের জন্যে অপেক্ষা কবছিলেন।

—যাহ'ক শেষ পর্যন্ত ফিরে এসেছিস। তারপর আমায় আদর করে বললেন:

—পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়িস নি তো?

আদলফ্ আলো নিয়ে আসছিলো—

—তোকে যেন একটু ফ্যাকাশে বলে মনে হ'চ্ছে—বাবা বললেন। চিন্তিত ভাবে লুই আমার কাছে এলো। তাকে আশ্বস্ত করবার জন্যে আমি হাসলাম।

—যাও—তোমরা আমার গাল দুটোকে গোলাপের মত আর কখনও দেখতে পাবে না।

আমি ঘর থেকে বেরিয়ে আমার ঘরে উঠলাম—লুই আমার পিছু পিছু এলো। সে অতি মৃদু স্বরে বললে।

—প্রিয়া···

সে আমার দিকে ঝুঁকে পঁড়লো। তার অধর আমার অধরের সঙ্গে মিলিত হ'লো। তার পর আমি আমার ঘরে প্রবেশ করলাম। সান্ধ্যভোজনের পোষাকে সজ্জিত হ'য়ে, আমি ক্রোয়ার নিকট নতজানু হ'য়ে বসলাম এবং ভগবানকে ডাকলাম। আমি যেই উঠে দাঁড়িয়েছি লুই এসে দরজায় করাঘাৎ করলে।

—ভেতরে এসো।

—যেতে পারি?

—নিঃসন্দেহে—আমি দরজা খুলে বললাম, তোমার কাছে আমার কিছু লুকোবার আছে নাকি। সে হেসে আমার কপালে চুম্বন দিলে। তাকে বসিয়ে আমি তার কাছে বসলাম। এক অবশ্যম্ভাবী আনন্দে আমার হৃদয় ভরা। এই মাত্র আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম—আমি যেন লুইয়ের সুযোগ্য স্ত্রী হ'তে পারি। আমি আমার প্রণয়ীর মুখের দিকে চেয়ে দেখলাম, উজ্জ্বল তার মুখমণ্ডল।

—কি ভাবছ? সে আমায় জিজ্ঞেস করলে।

—তুমি বড় ভালো লুই।

আমি আমার হাত তার হাতের উপর রাখলাম।

—আমার মারগেরীৎ···সে তার পকেট থেকে একটী ছোট্ট বাক্স বার করে একটী চমৎকার আংটি আমার আঙ্গুলে পরিয়ে দিলে। কিন্তু আংটিটা বড় হ'লো।

—হ'কগে বড়ো—খুলে পড়বে না।

লুই আমায় এক গোছা চুল দেখিয়ে বললে :

—জানো এ কার মাথার চুল ?

—তোমার মায়ের।

—না, তোমার,—সে হাসতে হাসতে বললো।

—কিন্তু আমার তো স্মরণ নেই।

—তা খুবই সম্ভব। তোমার যখন ভীষণ অসুখ সেই সময় আমি কেটে নিয়ে ছিলাম।

—তুমি আমার সঙ্গে স্যাঁন্ত ভিয়্যার্জ-এর কাছে প্রার্থনা করবে ?

আমরা উঠে ক্রুসিফিক্স-এর কাছে নতজানু হ'যে বসলাম—হাত ধরাধরি করে। একটী কথাও আমরা কইলাম না কিন্তু ভগবান জানলেন আমার বুকের কথা। তিনি জানেন আমাদের কি প্রয়োজন ; তিনি আমাদেব আশা মেটান।

—আমার প্রিয়া,—সে বললে।

—প্রিয়তম, আমি উত্তর দিলাম। আমরা জানলার কাছে চুপ চাপ দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ, তার পর আমরা নীচে নামলাম।

১১ মে

মা ভীষণ ব্যস্ত। আমি তাঁ'কে সাহায্য করতে পারলাম না, বাবা আমায় সাহায্য করতে অনুমতিও দিলেন না। আমি এবং লুই আজ নদীর ধারে বেড়াতে গেলাম। আমি একটী গাছের নীচে বসলাম। লুই আমার কাছে ঘাসের উপর শুয়ে পড়লো।

—কবে আমাদের বিয়ে হবে। এই কথাই আমার মাথায় ঘুরে বেড়াচ্ছে—সে হাসতে হাসতে লজ্জিত হ'য়ে বললে।

—কাল তো আমাদের বিয়ে লুই,—আমি বল্‌লাম অবাক হ'য়ে।

—হ্যাঁ, কিন্তু···

তার পর আমার দিকে চেয়ে :

—তোমার কি ইচ্ছে হয় আমরা দিন আরোও পেছিয়ে দিই।

—না না—তোমায় আনন্দ দেবার জন্যে আমি সব কিছু করতে রাজী আছি। আমি ভালো মেয়ে হ'তে চাই, বুঝলে তো!

তুমি তো চির কালই ভালো—সে আমার হস্ত চুম্বন করে বললে।

সেই সময় ঝোপ সরিয়ে কে এলো। দেখলাম মাদমোয়াজেল গোসেরেল—তার সঙ্গে একটী পুরুষ। লুই চমকে উঠে পড়লো। মাদমোয়াজেল গোসেরেল হাসলেন।

—বড় অসময়ে এসে পড়েছি, নয় কাপিত্যান?

তার পর আমায় লক্ষ্য করে বললে :

—তোর বাড়ী গেসলাম তোর খোঁজে—শুনলাম তুই বেরিয়েছিস, সে উচ্ছল হাসি হেসে চুপি চুপি বললে :

—আমি জানতাম না ভাই তোর সঙ্গে কে আছে, জানলে আসতাম না।

হাতের ছিপটি দিয়ে লুই তখন ঘাসের উপর আঘাত করছে—তাকে যেন একটু অস্থির বলে মনে হ'লো। মাদমোয়াজেল গোসেরেল আমার হাত ধরে বললে :

—তোর কি পরিবর্ত্তন হ'য়েছে ভাই!...কি রকম ফ্যাকাশে হয়ে গেছিস তুই।

আমাদের সঙ্গে সে তার সঙ্গীর পরিচয় করিয়ে দিয়ে চুপি চুপি বলেল :

—মস্ত ধনী লোকের উত্তরাধিকারী। ওর বাপ একজন ব্যবসাদার। জু'এর মত ধনী।

সে জিজ্ঞেস করলে গলা চড়িয়ে :

—তোর কি অসুখ করেছিল ?

—হ্যাঁ

—আমি তো জানতাম না! আমি পারীতে ছিলাম। তুই কি কখনও পারীতে গেছিস ।

—হ্যাঁ, একবার মাত্র।

—শুনছেন, মঁঃ ভালিন, মেয়েটা একবার মাত্র পারীতে গেছে।

মঁঃ ভালিন একটু মিষ্টি হাসি হাসলেন, এবং আমায় নমস্কার করে বললেন :

—যদি পারীতে আসেন—আমি আপনাকে দেখিয়ে দেব পারীর সব কিছু দেখবার জিনিস, তা'তে আমার ভারী আনন্দ হ'বে।

সেই সময় আমরা অনেক লোকের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম।

—এইরে! ওরা আসছে বললে মাদমায়োজেল গোসেরেল, এদিক দিয়ে সিলভি।

তিনজন স্ত্রীলোক ও দু'জন পুরুষ দেখা দিল।

—এসো ভাই এসো—একজন স্ত্রীলোককে লক্ষ্য করে মাদমোয়াজেল গোসেরেল বললে—এই দেখ আমার ইংরেজ বান্ধবী। তার পর আমায় বললেন :

—এরা আমার ফরাসী বন্ধু মাদমোয়াজেল ব্রিতেভ আর মারিতঁ, ইনি হ'লেন মাদাম কার্শা।

সে আমাদের সঙ্গে পুরুষ দুজনেরও পরিচয় করিয়ে দিলে। এত সব কথাবার্তায় আমি অতিষ্ঠ হ'য়ে উঠছিলাম। মনে হ'লো আমি পরিশ্রান্ত।

—কাল আমরা নদীর ধারে চড়ুই ভাতি করবো—তুই আসবি ?

আমি বললাম :

—না।

—একেবারে না! কেন ? যাঃ বল আসবি, আসবিতো ? লুই আমার হ'য়ে উত্তর দিলে।

—ওর পক্ষে কষ্টকর হ'বে।

—তা হ'লে আপনি আসছেন তো ?

—আমিও আসতে পারবোনা। আমায় ক্ষমা করবেন মাদমোয়াজেল আপনাকে অনুরোধ করছি।

মাদমোয়াজেল গোসেরেল হাসতে লাগলেন।

—আঃ, আপনি সব সময়েই একগুঁয়ে কাপিত্যান! কিন্তু আমার ভারি আনন্দ হ'বে আপনি এলে। আপনার মত পরিবর্তন করা কি কষ্টকর!

এই কথা বলে সে আমাদের করমর্দন করে চলে গেল।

১২ই মে

আজ বিকালে আমি বসেছিলাম জানলার কাছে সোফার উপর, সেই সময় লুই এসে আমার কাছে বসলো! সে আমায় তার বাহু-ডোরে বেঁধে রেখেছিল, এবং আমি তার কাঁধের উপর মাথা রেখে বসে-ছিলাম। তার কাছে বসে থাকতে আমার ভালো লাগে। আমি জানি, তাকে কত ভালোবাসি—আমি জানি সে সকল বিপদে আমার

অবলম্বন হ'য়ে থাকবে। তার গালের স্পর্শ আমার, কপালের উপর, তার হাতের মধ্যে আমার হাত, তার কাঁধের উপরে আমার মাথা—বড় ভালো লাগে আমার এমনি করে তার কাছে বসে থাকতে !

লুই আমার কাছ থেকে চলে গেলে পর বাবা এসে আমার কাছে বসে জিজ্ঞেস করলেন,—লুই কোথা ?

—ঐ তো—লুইকে দেখিয়ে বললাম। লুই তখন সিগারের ধুম পান করতে করতে পায়চারি করছিল।

—তুই সুখী তো মা ? বাবা চুপি চুপি আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ বাবা।

তিনি আনন্দিত হ'লেন।

—লুই তোকে নীস-এ নিয়ে যেতে চায়।

—জানি।

—তুই চলে গেলে আমাদের কষ্ট হ'বে।

—তুমিও তো আমার সঙ্গে যাবে—তুমি আর মা, যাবে না ?

—পরে যাবো মা। তোর এখন শীঘ্র যাওয়া উচিত এ ঠাণ্ডা দেশ ছেড়ে। পূবের হাওয়ায় তোর স্বাস্থ্য শীঘ্র ভালো হ'য়ে উঠবে। মাস ছয়েকের মধ্যে আমরা যা'বো তোর কাছে। যা'বার আগে আমাদের এখানকার কাজ গুছিয়ে যেতে হ'বে তো।

১৪ই মে

কাল আমাদের বিয়ে হ'য়ে গেছে। আমি আমাকে তার হাতে সমর্পণ করেছি ! পুরোহিত যখন তার হাত আমার হাতের মধ্যে দিলেন তখন যেন আমার মন শঙ্কায় ভরে উঠলো। ভগবান দয়া করুন যেন আমি তার সুযোগ্য পত্নী হ'তে পারি। গীর্জা থেকে

বা'র হ'লাম—সকলে আমাদের পথের উপর পুষ্প বৃষ্টি করছিল। হঠাৎ আমার মনে পড়লো একটী কবিতার কয়েকটী কলি—কোথায় যেন পড়েছিলাম।

ফুটে ওঠো ফুলে ফুলে পথের দুপাশ।
নব বধু সুন্দরী হ'তেছে বাহির।
পথে ভরা থাক নব প্রাণের নিশ্বাস॥
চলিয়া যাইছে বধু চরণ সুধীর॥

কবিতার শেষ লাইন ক'টি কিন্তু বড় বিষাদময়—

পথের দু'পাশে শুধু ভরা আঁখি জল।
প্রাণহীন সুন্দরী হ'তেছে বাহির।
দীর্ঘশ্বাসে ভরা থাক আজ জল স্থল॥
মরণ শয়নে বধু শুয়েছে সুধীর॥

আমারও কি তাই হ'বে! ভগবানই জানেন। তিনি যা ভালো বোঝেন করবেন।

বাবা ও মা আমাদের সামনে সামনে গেলেন বাড়ী পর্যন্ত।

সকলে আমাদের চারদিকে ঘিরেছিল। কতগুলি বুড়ো-বুড়ী আমাদের মুক্তকণ্ঠে আশীর্বাদ করছিল। তারা সকলে আমায় ভালো-বাসে, ছোট বেলা থেকে তারা দেখেছে আমায় বড় হ'তে! লুইও তার সরল মন ও পৌরুষ স্বভাবের দ্বারা সকলের মনের উপর প্রভাব বিস্তার করেছে। দরজার কাছে বাবা ও মা আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছিলেন। বাবা আমায় চুম্বন করে লুইকে আলিঙ্গন করলেন।

মা আমায় জড়িয়ে ধরলেন; তার চোখে জল—আনন্দাশ্রু। লুই চুপ চাপ ছিল। সে আমার মাকে আলিঙ্গন করলো।

—তোমার হাতে আমরা আমাদের একমাত্র কন্যাকে সঁপে দিলাম। আমি জানি তুমি তাকে কত ভালোবাস এবং তুমি তাকে সুখী করবে। ভগবান তোমাদের আশীর্বাদ করুন!

থেরেসও উপস্থিত ছিল। সে আমার গলা জড়িয়ে ধরে চিৎকার করে বললে :

—তুই সুখী হ'মা। তার পর নিচু গলায় সে বললে :

—কিন্তু বাছা, এতো ফ্যাকাশে হ'য়ে যাসনে।

বিকেলে আমরা সান্ধ্যভোজনে বসলাম। পুরোহিত, নগরপাল, তার বাড়ীর আর সকলে—ডাক্তার ও তার স্ত্রী এবং মাদাম গোসেরেল ও তার কন্যাকে নিমন্ত্রণ করা হ'য়েছিল। লুই আনন্দে উৎফুল্ল। মাদমোয়াজেল গোসেরেল আমার সঙ্গে রসিকতা আরম্ভ করলো কারণ আমি তাকে আমাদের বিয়ের কথা কিছুই বলিনি।

—ও দুষ্টু! কাল তোর সঙ্গে দেখা হোলো একটা কথাও তো বলিসনি।

—কারণ আমি জানতাম মা'র চিঠি তোমার বাড়ীতে তোমার জন্যে অপেক্ষা করছিল।

নবদম্পতির স্বাস্থ্য পান করলেন সকলে। মাদমোয়াজেল গোসেরেল বললেন :

—একটা চিঠিই যথেষ্ট না কি?

রাত দশটার সময় আমি আমার ঘরে গেলাম। সকলে আমায় ছেড়ে দিলে। ভীষণ পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিলাম। আমাদের জন্যে আমার ঘরখানা সাজানো হ'য়েছিল! পাশের ঘরটার দরজা খুলে দেওয়া হ'য়েছিল পোষাক রাখবার জন্যে। এতদিন সুখ-দুঃখে যে ঘরে কাটালাম আজ মনে হ'লো সে ঘরের যেন সব পরিবর্তন হ'য়ে

গেছে। কেবল ক্রুসিফিক্সটী সেই এক জায়গাতেই আছে। আমি সেই মূর্তির কাছে অনেকক্ষণ নতজানু হ'য়ে রইলাম। আজ সকালে উঠতে আমার অনেক দেরী হ'লো। লুই সে-সময় আমার ঘরে প্রবেশ করলো।

—যাক, শেষ পর্যন্ত ঘুম ভেঙ্গেছে। আমি তার দিকে বিস্ফারিত নয়নে চেয়েছিলাম, তা' দেখে সে বললে :

—তুমি সব ভুলে গেলে নাকি—প্রিয়া?

তার এই "প্রিয়" কথায় আমার চমক ভাঙ্গলো। তা হ'লে আমি চেয়ে আছি আমার "স্বামী'র" দিকে। তাকে দেখ্‌তে কী সুন্দর! আমার দুটী কাঁধের উপর সে তার হাত দুটী রেখে দাঁড়িয়ে ছিল। আনন্দোৎফুল্ল তার মুখমণ্ডল। অসীম প্রেমে পরিপূর্ণ তার চোখের চাউনি। তার গোলাপের মতো অধরে—মৃদু-হাসি। একটু উন্মুখ অধরের অন্তরালে দেখা যাচ্ছিল হাতীর দাঁতের মত সাদা দাঁতগুলি। সোনার রংএর ঢেউ খেলান চুল থেকে উদিত সূর্যের আলোর মত লাল ও সোনালী রং বিচ্ছুরিত হ'চ্ছিল। আমি তার গলা জড়িয়ে ধরে আমার অধর তার অধরের উপর রাখলাম। সে আমার কাছে বসলো আমি তার বুকের উপর মাথা রাখলাম। আমার মাথাব চুলে আমার মুখখানা অর্দ্ধেক ঢাকা পড়ে গেস্‌লো—সে চুলগুলি সরিয়ে দিলে। আমি আরো ঘেঁসে বসলাম তার কাছে। আমি চাইলাম তার দিকে হাসতে-হাসতে, আনন্দভরে ও সবিশ্বাসে; সে আমার স্বামী, আমার বন্ধু। ভগবানকে ধন্যবাদ দিলাম এত ভাল, এত প্রেমময় এত অনুগত স্বামীকে পাওয়ার জন্যে। ক্রুসিফিক্সের কাছে গিয়ে আমরা দুজনে প্রার্থনা করলাম! আমার স্বামী নেমে গেলেন। আমি নামছি এমন সময় দেখি তিনি উঠছেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম :

—কি হ'লো ?

—কিছু নয় আমার ঘড়ি ভুলে গেছি। সে আমায় একটু আদর করে খোলা দরজা দিয়ে ঘরে ঢুকে গেল। থেরেস চারতলা থেকে নামছিল।

—উঠেছ মা ? খুব আনন্দ, নয় ?—যেন চড়াই পাখিটার মত ঘুম ভেঙ্গে উঠেছিস কিন্তু তোর সব রং টুকু ফিরে আসেনি মনে হয়। আমি কি তোকে বলিনি তোর জীবন আবার মধুময় হ'য়ে উঠবে।

আমি হাসলাম। লুই ঘর থেকে বা'র হ'লো।

—কি হ'লো থেরেস ? সে জিজ্ঞেস করলে।

—আমি বলছিলাম আপনার যত্নে মাদমোয়াজেলের গাল দুটো শীঘ্রই লাল হ'য়ে উঠবে।

—ও কি আর মাদমোয়াজেল আছে নাকি থেরেস,—সে হাসতে হাসতে বললে।

সত্যিই তো! আমি কি মুখ্যু—থেরেস বল্‌লে কপালে করাঘাত করে—এখন তোমায় আমার মাদাম বলা উচিত। সেই ছোট্ট মেয়েটার আবার বিয়ে হ'লো! বড় বুড়ী হ'য়ে গেছি কি না তাই!

লুই হাসতে লাগলো। আমরা খাবার ঘরে এলাম। বাবা আমায় চুম্বন দিয়ে অভ্যর্থনা করলেন। এবং জিজ্ঞেস করলেন "কেমন আছিস"। মা মৃদু হাসছিলেন। মা টেবিলের উপর রাখা একটী ছোট বাক্স ও একখানি চিঠি আমায় দেখালেন।

—আমার জন্যে ?

—হ্যাঁ তোর দিদিমা দিয়েছেন।

বাক্সের ভিতর ছিল দুটী পাথর বসান সুন্দর সোনার কাঁকন।

—আমায় ভারি মানাবে,—আমি হাসতে হাসতে বললাম।

—পরে, দেখ! লুই বললে। না আগে চিঠি পড়।

চিঠিখানা আশীর্বাদে আশীর্বাদে ভরা। বিয়ের উপহার স্বরূপ দিদিমা পাঠিয়েছেন কাঁকন জোড়া এবং তিনি জানিয়েছেন কবে আমি আর আমার স্বামী তাঁর কাছে যা'বো সে জন্তে আশা করে রইলেন।

আমি এবং আমার স্বামী, দুজনে বেড়াতে গেলাম বনের ভিতর। আমি সবুজ ঘাসের উপর বসে পড়লাম চেরী গাছের ছায়ার তলায়। লুই আমার পাশে শুয়ে পড়লো—আমার কোলে মাথা রেখে।

—লুই তোমার মা'র কথা আমায় বলো,—আমি ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলাম।

লুই কথার উত্তর না দেওয়াতে ভাবলাম সে দুঃখিত হ'য়েছে—

—তুমি দুঃখিত হ'লে লুই।

সে আমার দিকে চেয়ে তার হাতের মধ্যে আমার হাত ধরে বললে:

—দুঃখ! না-না—দুঃখিত হব কেন? আমি ভাবছি আমার মা কত আনন্দিত হ'তেন তোমায় দেখতে পেলে। তিনি নিশ্চয় এখন উপর থেকে আমাদের দেখছেন, এবং আমাদের আশীর্বাদ করছেন।

—তাঁর ছবি আছে তোমার কাছে?

—এখন নেই বাড়ী গিয়ে দেখাবো। তাঁর এক গোছা চুল আমার কাছে আছে।

তার ঘড়ির চেনে একটী পদক ছিল, সেই পদকের ভিতর দু'গোছা চুল ছিল।

—এই দেখ এই সোনার মত চুল আমার মায়ের, আর এই রুপোর তার জড়ান কটা চুল আমার বাবার।

—তা হ'লে তাঁর মাথার চুলের রং ছিলো সোনার মতো ?

—হ্যাঁ ; আমার মা ছিলেন খুব সুন্দরী—আমার মত মোটেই না। এই কথা বলে হাসতে হাসতে সে আমার পানে চাইলো।

—খুব কম বয়েসেই বাবার সঙ্গে তাঁর বিয়ে হ'য়েছিলো তোমার চেয়েও ছোট ছিলেন। এই কথা বলে সে আমার হাতে চুম্বন করলে।

১৭ই মে

কাল আমরা যা'বো। সকলে যেন বিমর্ষ হ'য়ে আছে। লুই ও বাবা চেষ্টা করছিলেন উৎফুল্ল হ'বার জন্যে কিন্তু বেশ বুঝতে পারলাম যে বাবা মোটেই আনন্দিত ছিলেন না। মা আমার পাশে বসে বুনছিলেন, আমি সেলাই করছিলাম। মা আমার পানে মাঝে মাঝে চাইছিলেন আর তাঁর জামার হাতায় চোখ মুছছিলেন। আমার মা! আমায় ছাড়তে তাঁর কষ্ট হ'চ্ছে অথচ এখানেও আর বেশী দিন থাকতে দিতে চান না।

—তোকে হাওয়া বদল করতেই হবে…তার উপর স্বামী তো থাকবেন তোর সঙ্গে? আমার কষ্ট কেন হ'বে? তিনি হাসতে হাসতে আমায় বললেন।

বাবা এসে আমার কাছে বসলেন। তিনি বলছিলেন মা, আর তিনি শীঘ্রই নীসে গিয়ে আমাদের সঙ্গে যোগ দেবেন। আমি আমার চোখের জল চেপে রাখলাম এই ভয়ে, পাছে তাঁরা আরো বেদনা পান। বিকেল দু'টার এক্সপ্রেস ট্রেনে আমরা যাবো।

আমি আমাদের ঘরে ছিলাম ; কাঁদছিলাম। আনন্দিত মনে আমি আমাদের বাড়ী ও আমার মা বাবাকে ছেড়ে যেতে পারছিলাম না। থেরেস প্রবেশ করলো।

—দুঃখ কিসের মা! তোকে দুঃখ করতে দেখলে কাপিত্যান বলবে কি? তোকে কাঁদতে দেখলে তার দুঃখ হবে যে। স্বামীর সঙ্গে মধুচন্দ্রিকা করতে বিদেশে বেড়াতে গেলে কি কাঁদতে হয়।

সে জল দিয়ে আমার চোখ ধুইয়ে দিলে। সে সত্যি কথাই বলেছে। আমায় এ-অবস্থায় দেখলে লুইয়ের সত্যিই কষ্ট হবে। মা এলেন আমার ঘরে আমায় আলিঙ্গন করতে। তারপর তিনি আমার স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক উপদেশ দিলেন। প্রায় দশটা পর্যন্ত তিনি আমার কাছে রইলেন। লুই ঘরে আসতে তিনি তাকে কাছে বসালেন। তিনি বললেন:

—আমাদের মেয়ের সুখ দুঃখের ভার সব তোমায় হাতে ছেড়ে দিয়েছি, তোমাকে ছাড়া আর অমরা কারুকে জানিনা। তুমি ওকে সুখে রাখবে। ওর যত্ন কোরো লুই—ও একেবারে শিশু, এখনও ভীষণ দুর্বল।

—হ্যাঁ মা—তারা প্রায় পনের মিনিট কথা কইলো।

১৯শে মে, পারী

কাল আমরা ব্রিটেন ছেড়েছি। এখানে রাত বারোটাব সময় এসে পৌঁছেছি। বাবা ও মা'র কাছ থেকে বিদায় নেবার সময় আমি অজস্র অশ্রু বর্ষণ করেছি। তারা আমাদের সঙ্গে ষ্টেশন পর্যন্ত এসেছিলেন। মা আমায় বুকের উপব জোরে চেপে ধরে ছিলেন এবং চুম্বনে চুম্বনে আমার মুখমণ্ডল ভরে দিচ্ছিলেন। বাবাও আমায় আলিঙ্গন করেছিলেন। আমিও তার গললগ্ন হ'য়ে নীরবে কেঁদেছিলাম। তিনি বললেন:

—যা মা, কাঁদিসনি—তোকে কাঁদতে দেখলে আমার কষ্ট হয়।

তার গলার স্বর কেঁপে উঠলো। তার পর তিনি হাসতে হাসতে বললেন :

—আর, নতুনের সংসারে পুরাতনের প্রয়োজন কি বলতো মা ?

মা আমাকে ও লুইকে আলিঙ্গন করলেন।

—আমার মেয়েকে দেখো বাবা—মা বললেন।

বাবা আমাদের, আমাদের কামরায় নিয়ে যাচ্ছিলেন। লুই বাবার করমর্দন করলেন।

আর একবার আমায় চুম্বন করে বাবা বললেন "ভগবান তোদের আশীর্বাদ করুন"। ট্রেন ছেড়ে দিল। যতক্ষণ দেখা গেল ততক্ষণ বাবা আর মা'র দিকে চেয়ে রইলাম। শেষ পর্যন্ত তাঁরা সুদূরে মিলিয়ে গেলেন। মনে হ'লো বুকের ভিতরটা খালি হ'য়ে গেল। আমার স্বামীর দিকে চাইলাম। তার জন্যে আমি সব ছাড়লাম জনক জননী—জন্মভূমি—আমার বিগত জীবন। তার প্রেমময় স্বচ্ছ দৃষ্টি আমার দৃষ্টির সহিত মিলিত হ'লো· আমার মনের মধ্যে—এক আজনা আশা জাগিয়ে তুললে। তার কাঁধের উপর আমি আমার মাথা রাখলাম—তার হাতের মধ্যে আমার হাত রাখলাম—এবং নিঃশব্দে কাঁদতে লাগলাম। সে তার বাহু ডোরে আমায় বন্ধন করে রাখল। ক্রমশঃ আমি শান্ত হ'য়ে মাথা তুললাম।

· আমার জন্যে তুমি বিরক্ত হ'য়ে পড়েছ নয় ? আমি বললাম।

—আমি! বিরক্ত! সে হাসতে হাসতে বল্‌লে—কখনো কি বিরক্ত হ'য়েছি আমি মারগেরীৎ ?

কামরায় আলো জলে উঠতে, দেখলাম আমাদের কামরার বসে একজন বয়েসী ভদ্রলোক—সে আমাদের দিকে মনোযোগ সহকারে দেখছিল। আমি বেশ অবাক হ'য়ে গেলাম। সে নিশ্চয় আমার

কান্না দেখেছে। আমি দৃষ্টি দিয়ে স্বামীকে জিজ্ঞেস করলাম—সে এই অচেনা ভদ্রলোকের উপস্থিতি লক্ষ্য করেছে কি না। সে হেসে জানালে যে সে লক্ষ্য করেছে ভদ্রলোককে দেখে, আমি যে অবস্থায় বসেছিলাম, সে অবস্থা থেকে লজ্জায় সরে গেসলাম—লুই আবার জোর করে সেই অবস্থায় আমায় বসালো! আমরা নিচু গলায় কথা কইতে লাগলাম। কামরার ভিতর নির্জন! সেই ভদ্রলোক আমাদের জিজ্ঞেস করলেন :

—মশাই আপনি কি পারীতে যাচ্ছেন?

হ্যাঁ, কেবল দু'একদিনের জন্যে—আমরা যা'বো পূবে।

অপরিচিত আমার দিকে চাইলেন।

—আমিও পারী যা'বো, আমি ডাক্তার ল্যাফ্যার্ম। আপনি বুঝি একজন মিলিত্যার—দেখেই আপনাকে বুঝতে পেরেছি।

—আমি ২২নং রেজিমেণ্টের কাপিত্যান লেফ্যাব্র,—লুই হাসতে হাসতে উত্তর দিল।

—মাদামের কি অসুখ করেছে? ডাক্তার সবিনয়ে জিজ্ঞেস করলেন :

—কয়েক দিন হ'লো রোগ থেকে উঠেছেন—লুই উত্তর দিলে।

তিনি যেন আমার পানে একটু সংশয় ভরে চেয়ে রইলেন। অপরিচিতের প্রশ্নে লুই যেন মুস্কিলে পড়েছিল। আমি দুর্বল কি না ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন।

—না, একটুও নয়, আমি উত্তর দিলাম।

ভদ্রলোক একটু আস্বস্ত হ'লেন।

আমরা "লোতেল দে লুভ্র"-এ উঠলাম, তখন সকাল ছ'টা। বাড়ীতে আমার সকাল সকাল উঠা অভ্যাস, সে অভ্যাস আমার যায় নি।

যখনি আমার মনে পড়ে আমাব দেশের কথা, আমার মায়ের কথা, আমার বাবার কথা, তখনই আমার দু'চোখ জলে ভরে ওঠে....তা হলেও আমি সুখী—সত্যিই সুখী। তখন ও ঘুমুচ্ছে। আমি চাই না সে আমার চোখের জল দেখতে পায়। মনে হ'চ্ছিল বহুদিন আমি আমার দেশ ছেড়ে চলে এসেছি ; মাত্র কাল আমি দেশ ছেড়ে এসেছি সে কথা ভাবতেও পারি না। আজ আমি আমার দিদিমা'কে দেখতে যা'বো। হয়তো তিনি জানেন না আমরা আজ তার কাছে যা'বো কিন্তু আমাদের দেখে তিনি নিশ্চয় সুখী হ'বেন। এখানে আমরা খুব বেশী থাকি তো দু'দিন থাকবো। যত শীঘ্র সম্ভব লুই আমায় পুবে নিয়ে যা'বে। আজ দিদি ভেরোনিকের ক্রোয়ার কাছে প্রার্থনা করেছি—ক্রোটী সব সময় আমার গলায় থাকে। তিনি যখন মা'রা যা'ন তখন তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ যুবতী। এ পৃথিবীতে মোটে তিনি ছাব্বিশ বছর বেঁচে ছিলেন এবং সেটুকু সময়ের মধ্যে আনন্দের চেয়ে বেদনা পেয়েছেন অনেক বেশী। এখন তিনি শান্তিতে আছেন। লুইয়ের ঘুম ভাঙ্গলো।

—উঠতে দেরী হ'য়েছে আমার ?

সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আমায় আলিঙ্গন করলে।

আজ আর লিখবো না কারণ আজ কি করা হ'বে না হ'বে সেই কথাই সে কইতে লাগলো।

..আমরা আমার দিদিমাকে দেখতে গেলাম। চাকর তাঁকে খবর দিতে, তিনি এসে হাজির হ'লেন আমাদের সামনে।

—ভেতরে আয়, ভেতরে আয় ! তিনি উৎফুল্ল হ'য়ে বললেন।

আমরা বসবার ঘরে প্রবেশ করলাম। তিনি আমাদের হাত ধরে আরম্ভ করলেন ঃ

—দুজনে খুব সুখী তো ?—জিজ্ঞেস করাই ভুল এ-কথা আমার। কিন্তু বাছা তুইতো বড় রোগা আর রক্তহীন হ'য়ে গেছিস। তা হ'লে তোর ভীষণ অসুখ করেছিল বল ? তারপর, তোর মা, বাবা কেমন আছেন ? ভালো তো ?

লুইকে বসিয়ে আমায় একটা সোফায় বসালেন।

—এইখানে শুয়ে পড়, নিশ্চয় পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়েছিল।

—মোটেই না, আমার গায়ে খুব জোর আছে একটুও দুর্বল নই।

তিনি লুইয়ের দিকে চাইলেন।

—সত্যিরে লুই ? তা হ'লে তোরা আমার সঙ্গে খাবি···না-না, কোন কথা শুনবোনা, আমার ইচ্ছে পুরণ করতে হ'বে।

তিনি যে উপহার আমায় পাঠিয়ে ছিলেন, সে জন্যে আমি তাঁ'কে ধন্যবাদ দিতে যাচ্ছিলাম। তিনি আমায় কোন কথা বলতে না দিয়ে বললেন :

—আমি কোন কথা শুনতে চাইনা। তোরা দুজনে আমার সঙ্গে আজ খাবি, তা হ'লেই আমি আমার উপহারের মূল্য ফেরৎ পাবো।

উপায় নেই, আমাদের রাজী হ'তে হ'লো। তিনি নানা কথা কইতে লাগলেন—বিশেষ করে আমাদের শিশুকালের কথা।

—আমি জানতাম শেষ পর্যন্ত তোরা বিয়ে করবি। আমি জানি প্রথম দৃষ্টিতে লুই তোকে ভালবেসেছিল। সে-দিন ছিল তার জন্মোৎসব—বয়েস সাত বছর, আর তোর বয়েস দুই। ছোট ছেলেদের নাচ ছিল সে উৎসবে। নানা বয়সের ছোট ছেলেমেয়েতে ঘর ভর্তি—দু'বছর বয়েস থেকে বার বছর পর্যন্ত। লুই-এর হাতে ছিল একগাছি মালা—সে পরিয়ে দেবে সেই মালা, তার গলায়, যা'কে সে তার

অন্তরের রাণী বলে বেছে নেবে। অনেক সুন্দর ছোট মেয়েরা তার সামনে এলো কিন্তু এ-মহারাজের কারুকে পছন্দ হ'লো না। সেই সময় এসে হাজির হ'লো তোর মা তোকে কোলে করে। সেই প্রথম সে তোকে দেখলে। সুন্দর সাদা পোষাকে তোকে সুন্দর দেখাচ্ছিল—তোর কালো কালো চুলের গোছা—তোর বড় বড় কালো চোখ। ওর আর তর সইলোনা, তুই ওর কাছে এগিয়ে আসিস। ও এগিয়ে গিয়ে তোর গলায় মালা পরিয়ে দিলে, সঙ্গে সঙ্গে তোর মুখের উপর দিলে একটী মিষ্টি চুমু—আমরা হাসতে লাগলাম—ওর মায়ের কী আনন্দ। সে তোকে কোলে করে জিজ্ঞেস করলে তুই তার বউ হ'বি কি না; তুই উত্তর দিলি "হাঁ"—গম্ভীর হ'য়ে।

দিদিমা চোখ মুছলেন। লুই আমার হাতের উপর চাপ দিলে, এবং আমাদের দৃষ্টি মিলিত হ'লো।

২৬শে অক্টোবর ১৮৬১

আজ ছ'মাস হ'লো আমরা নীসে সংসার বেঁধেছি। এই ছোট্ট সহরটী আমার বেশ লাগে। অনেক দিন আমি দিনপঞ্জী লিখিনি। লেখবার সময় ছিলনা। আমার স্বামীর ইচ্ছে, যতক্ষণ পারি খোলা হাওয়ায় থাকি। রাত্রে আটটার আগেই আমি ঘুমিয়ে পড়ি। আমার স্বাস্থ্য যে ফিরে আসছে এইটেই তার যথেষ্ট প্রমাণ। মধ্যসাগরের কূলে আমরা অনেকক্ষণ বেড়াই। কি সুন্দর! নীল সমুদ্র—সূর্যের আলো পড়ে নীল সমুদ্রের বুক চক্‌চক্ করছে—চোখ ঝল্‌সে যায়। বাগানে বসে বিকেলের দিকে আমরা সান্ধ্যভোজন করি। সেখান থেকে আমরা দেখতে পাই দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র, বুকে তার চন্দ্রমার প্রতিচ্ছবি।

সেখানে আমরা বহুক্ষণ বসে থাকি ; সে আমায় বেঁধে রাখে সুদৃঢ় বাহু ডোরে। আমি তার বুকের উপর মাথা রেখে তার একখানি হাত আমার হাতের মধ্যে ধরে বসে থাকি। সময়ে সময়ে এমনি অবস্থায় আমি ঘুমিয়ে পড়ি, সে আমায় দুহাতে করে তুলে নিয়ে যায় আমার ঘরে। অনেক চেষ্টা করি যা'তে ঘুমিয়ে না পড়ি—কিন্তু পারিনা। ঘুমিয়ে পড়ি অনিচ্ছা সত্ত্বেও। সে বলে আমি তার ওভার কোটের চে' হালকা। লুই কত ভালো, কতো সে আমায় ভালোবাসে! তার স্ত্রী হ'য়ে তার কাছে থাকতে আমার কত আনন্দ।

মা বাবা কেউই এখনও আসেন নি। তাদের চিঠি রোজই পাই। তারা জানিয়েছেন, আসছে মাসে আসতে পারবেন না। অগস্টের শেষে তাদের দেখবার কত আশা করে ছিলাম—সে আশা আমার মিটল না।

লুই মাঝে মাঝে পারীতে যেতে বাধ্য হয়, সেখানে তার রেজিমেণ্ট। খুব বেশী সে দু'দিন অনুপস্থিত থাকে। কাল সকালে সে পারী গেছে। সেখান থেকে লিখেছে আজ বিকেলে ফিরবে, এবং আমায় ষ্টেশনে যেতে মানা করছে—তার ভয় হয় আমার কষ্ট হ'বে, তবে সে অনুমতি দিয়েছে বাগানের দরজা পর্যন্ত যেতে। তাকে আমার কিছু বলবার আছে—এমন কিছু যা' ভাবলে আমার সারা অঙ্গে সুখের কম্পন জেগে ওঠে।

এখন ছ'টা বেজেছে ; আর আধ ঘণ্টার মধ্যে লুই এসে পড়বে। আজ আমি বন্ধ করলাম আমার দিনপঞ্জী। যাই বাগানে তার জন্যে অপেক্ষা করিগে।

২৪শে অক্টোবর

সে-কথা কাল আমার স্বামীকে বলেছি। খাবার পর আমরা বাগানে বসেছিলাম; পারীতে সে যা কিছু করেছে সব আমায় বলতে লাগলো। আমরা কিছুক্ষণ চুপচাপ ছিলাম— সেই সময় আমি মুখ না তুলেই বললাম:

—লুই, আমার মনে হয়—ইতস্ততঃ করতে লাগলাম—মনে হয় আমাদের একটী সন্তান হ'বে।

সে আমার দিকে ঝুঁকে পড়ে আমায় চুম্বন করলে।

কাল থেকে পৃথিবীর রূপ যেন আমার চোখে বদলে গেল—প্রকৃতিও যেন আমার আনন্দে যোগ দিয়েছে। আমার জানলার কাছে গোলাপ-কুঞ্জের উপর বসে পাখির দল আনন্দে কুজন করতে থাকে: তাদের ছোট ছোট চোখের সন্দিগ্ধ দৃষ্টি দিয়ে আমার দিকে চেয়ে থাকে; মনে হয় যেন তারা আমার আনন্দে আনন্দিত। ফুলগুলোও যেন আরো বেশী করে ফুটে উঠছে। সমুদ্রের কুলে যখন বসে থাকি তরঙ্গকুল আমার পায়ে এসে যেন প্রণাম করে ভবিষ্যতের মানুষটীকে। ভগবান! মঙ্গলময় তুমি কত দয়াময়। আজ সকালে ঘুম ভেঙ্গে উঠে আমি নিদ্রিত লুই-এর মাথার কাছে দাঁড়িয়ে তার সরলতা মাখা মুখমণ্ডলের দিকে চেয়ে রইলাম। তাকে আমি কত ভালোবাসি! ঐ আমার স্বামী, আমার সন্তানের পিতা। দশমাস আগেও আমি তাকে বিয়ে করতে চাইনি, আর সে কতদিন থেকে আমায় ভালোবাসে! আমি কি অকৃতজ্ঞ ও কত পাপ করেছি ওর কাছে। যাক! এখন আমি তোমায় ভালোবাসি প্রিয়তম 'আমার জীবনের চে' তোমায় ভালোবাসি, তুমিও তো ঐ একই কথা আমায় বলেছিলে

চেরি গাছের তলায়”। আমি ঝুঁকে পড়ে তাকে আলতোভাবে চুম্বন করলাম, তারপর জানলা খুলে দিলাম। অগস্ট ম্যাসের উত্তপ্ত আলোর ঢেউ খেলে গেল ঘরের ভিতর। সূর্য তার উজ্জ্বল রশ্মি দিয়ে যেন আমায় বলতে চায় “নমস্কার”, পাখিরাও যেন বলে “প্রণাম লও”। আমার মনে হয় আমার মনের কথা চিৎকার করে বলি। সে কথা আমি চুপি চুপি বলেছি অঞ্জলি ভরা গোলাপ ফুলকে। শিশিরের মুক্তা খচিত গোলাপ ফুলগুলিকে আমি যেশুর প্রতিমূর্তির পায়ে দিলাম আমার আশার নৈবেদ্য স্বরূপ। অনেকক্ষণ চেয়ে রইলাম সুন্দর ক্ষুদ্র যেশুর দিকে। আমার শিশুও ঐ শিশু যেশুর মত হ’বে। আমি নতজানু হ’য়ে বসলাম প্রার্থনা করবার জন্যে। তাকে আমি ধন্যবাদ দিলাম আমার প্রতি তার করুণার জন্য। তারপর আমি মেরী মা’কে প্রার্থনা করলাম “মা, আমাদের জীবন দায়িনী, দাও মা আমায় ক্ষমতা ও জ্ঞান আমার শিশুকে সরল করে মানুষ করে তোলবার—তোমার পুত্রের অন্তঃকরণের মত অন্তর যেন সে পায়”।

২৫এ অক্টোবর

কাল আমরা নিচের তলার বসবার ঘরে বসে ছিলাম, অকূল সমুদ্রের দিকে চেয়ে। আমি একটী সোফার উপর বসে ছিলাম, লুইও বসেছিল আমার কাছে, আমার হাত তার হাতে নিয়ে। আমাদের সন্তান সম্বন্ধে আমরা কথা কইছিলাম। আমি বললাম :

—তোমার মত ও সৈনিক হ’বে, নয় লুই ?

—যদি তার মা তাই চায়,—সে হাসতে হাসতে বললে।

—হ্যাঁ আমি তাই চাই, ঠিক তোমার মত হ’বে সে। দেখবে সে হ’বে দ্বিতীয় লুই লেফ্যাব্র। তুমি যে রেজিমেণ্টে আছ সেই

রেজিমেণ্টেই সে থাকবে, সে তার বাপের অধীনে কাজ করবে। আমি নিজেকে গর্বিতা বোধ করবো এই ভেবে যে আমার স্বামী ও আমার পুত্র দুজনেই ২২নং সৈন্য শ্রেণীভুক্ত। আর তার বয়েস যখন হ'বে একুশ সে হ'বে তোমার মত ক্যাপিত্যান আর তুমি হ'বে মারেশাল।

—ফ্রাঁসের মারেশাল ?

—হ্যাঁ—নিশ্চয় তাই—কেন, মারেশাল হ'বার মত সাহস কি তোমার নেই ? তারপর তুমিই তো তা'কে অস্ত্র-চালনা শেখাবে। যেদিন থেকে সে অস্ত্র ধরতে শিখবে সেদিন থেকে তুমি তাকে অস্ত্র চালনা শেখাবে—তার পর প্রথম যখন সে নাম কিনবে সকলে বলে উঠবে "কে এ"—এবং আর আর সকলে উত্তর দেবে "মারেশাল লেফ্যাব্র-এর সন্তান"। আর আমি বলবো চুপি চুপি "ও আমাদের পুত্র"

২৬শে অক্টবর

কাল আমরা বনে বেড়াতে গেসলাম। গাছের ছায়ায় ছায়ায় কিছুক্ষণ বেড়াবার পর সাধারণত যেখানে আমরা বিশ্রাম করি সেই জায়গায় প্রবেশ করলাম। একটী অলিভ গাছের নিচে ছোট ছোট সবুজ ঘাসে ভরা একটী জায়গা ছিল আমাদের বিশ্রাম করবার স্থান। জায়গাটা যেন আমাদের জন্তেই আগে থাকতে ঠিক করা ছিল। সবুজ ভূমির চারি দিকে বুনো গোলাপের কুঞ্জ। সেখানে আমি বসলাম, লুই আমার পাশে শুয়ে পড়লো, আমার হাঁটুর উপর মাথা রেখে তার অভ্যাস মতো ; সে আমার দিকে চেয়ে আমার গলার হারে ঝোলানো তার ফটোগ্রাফ সম্বলিত পদকটী নিয়ে খেলা করতে লাগলো।

—আমি ঘুমিয়ে পড়ছি, এই কথা বলে সে চোখ বুজলো। আমি তার দিকে চেয়েছিলাম। তাকে দেখতে সত্যি সুন্দর। আমার সাদা মুসেলিনের পোষাকের উপর তার বাদামী মুখমণ্ডল যেন বড় বেশী স্পষ্ট দেখাচ্ছিল। তা'র বাঁ-হাতখানি তখনও আমার হারের পদক নিয়ে খেলা করছিল আর তার ডান হাতখানি পড়ে ছিল ঘাসের উপর অলস হ য়ে। সে চোখ খুলে আমার দিকে চাইলে।

—কি ভাবছো?

—আমাদের ছেলে সুন্দর হ'বে লুই, যদি তাকে তার বাপের মত দেখতে হয়।

—যদি আমি সুন্দর হই, তা হ'লে আমায় চুম্বন কর, সে হাসতে হাসতে বললে। আমি তার উপর ঝুঁকে পড়লাম, সে আমার গলা জড়িয়ে ধরলে।

—মারগেরীৎ, মারগেরীৎ, আমি তোমায় কত ভালোবাসি, সে মৃদু স্বরে বললে।

সেই সময় শুনতে পেলাম কে যেন ঝোঁপ সরাচ্ছে। লুই সেদিকে মুখ ফেরালে। একটী পুরুষ সে-স্থানের প্রবেশ পথে দেখা দিল। লুই দাঁড়িয়ে উঠলো।

—আরে! ভিয়ার, তুই এখানে হঠাৎ! সে আনন্দে চিৎকার করে উঠলো।

—বেড়াতে,—উত্তর দিল আগন্তুক। কিন্তু জানিস কিসের আশায় নীসে বসে আছি? তোর আর মাদামের জন্যে। সে আমায় নমস্কার করলে।

—মানে? এসে পর্যন্ত তোর দেখা পাইনি,—লুই একটু অবাক হ'য়ে বললে।

—কিন্তু দেখ এই বনের ভেতর তোরা সুন্দর ছবির মত ফুটে ছিলি, আমি তোদের কাপড়ের উপর তুলে নিয়েছি, তুই আমার সে জন্যে ক্ষমা করবি তো ?

—কী ! তোকে ক্ষমা ! তোর কথা শুনেই তো আমার বুক গর্বে ভরে উঠছে।

—আর মাদামও আমায় ক্ষমা করবেন, ক্ষমা করলেন তো ?

—নিশ্চয়—ক্ষমা করবার মত যদি কিছু থাকে, কিন্তু কিছু আছে বলে তো মনে হয় না।

—ধন্যবাদ মাদাম, আপনি বড় উদার।

—কিন্তু ভিয়ার ছবিটা কি আমরা দেখতে পারি ?

—এখন নয় ; দাঁড়া, আগে শেষ আঁচড় দিয়ে নি, এখন তো কেবল একটা স্কেচ হ'য়েছে।

—তা হ'লে আমাদের ওখানে আজ তোমায় খেতে হবে।

—সানন্দে—এই অবস্থায় যদি মাদাম আমায় অভ্যর্থনা করেন তবেই।

—রাখ তোর পার্দীব শিষ্টাচার।

আমি বল্‌লাম।

—লুইয়ের যা'রা বন্ধু তারা আমারও বন্ধু এবং আমাদের বাড়ীতে তাদের সর্বদাই সমাদরে অভ্যর্থনা করা হ'বে।

আমরা বাড়ীর পথ ধরলাম।

—আমি জানতাম না তোর বিয়ে হ'য়েছে লেফ্যাব্র, ভিয়ার বললে।

—কি করে জানবি ; অনেক দিন তোর সঙ্গে দেখাও হয়নি চিঠিও লিখিনি তোকে। মে মাসে আমাদের বিয়ে হয়েছে।

--আর আমাকে তুই একটা লাইনও লিখলি না। বেশ বন্ধুত্ব, নয় মাদাম? ভিয়ার আমার দিকে ফিরে হাসতে হাসতে বললে। থা'ক তোর বন্ধুত্বে আর আমার দরকার নেই মাদামের মত সুন্দরী স্ত্রীলোককে বিয়ে করলে বন্ধুর কথা আর কার মনে থাকে, সে ঠাট্টার ছলে বললে।

লুই তার বন্ধুর কাঁধের উপর হাত রাখলো।

—নেহাত মিছে কথা তুই বলিসনি ভিয়ার—সত্যিই আমি এখন ভীষণ সুখী

তার বন্ধু, তার ক্ষণিক নিমিলিত চোখের দিকে চেয়ে রইলো।

—তা আমি জানি লেফ্যাভ্র, শুনে ভারি আনন্দ হ'লো। সে বন্ধুর করমর্দন করলো!

খাওয়া দাওয়ার পর লুই বন্ধুকে গান গাইতে বললো।

—জানো মারগেরীৎ, ও মারিও'র মত গান গায়। আমিও লুইয়ের সঙ্গে যোগ দিয়ে তাকে অনুরোধ করলাম। লুই জানলার কাছে বেতের চেয়ারে বসলো, আমি তার কাছে একটা কুশনের উপর বসলাম। সে আমার মাথাটা তার হাঁটুর উপর টেনে নিয়ে তার হাত আমার মাথার চুলের উপর রাখলে। ভিয়ারের গলার স্বর শুনেই আমার বুকে জেগে উঠলো এক পুরাতন স্মৃতি; এ সুরটা আমার জানা—ভুলে গেসলাম। সে গান আরম্ভ করলে। হ্যাঁ! এখন মনে পড়ছে:

ফুটে ওঠো ফুলে ফুলে পথের দুপাশ
নব বধু সুন্দরী হতেছে বাহির
পথে ভরা থাক নব প্রাণের নিশ্বাস
চলিয়া যাইছে বধ চরণ সুধীর।

এ সেই জুঁই ফুলের গান! আমার মনে জেগে উঠেছিলো আমাদের বিয়ের দিন। নব বধুকে কবরে নিয়ে যাওয়া হ'চ্ছে, গানের শেষ কলি ক'টী তা'রই বর্ণনা দিচ্ছে।

পথের দু-পাশে শুধু ভরা আঁখি জল
প্রাণহীন সুন্দরী হ'তেছে বাহির
দীর্ঘশ্বাসে ভরা থাক আজ জলস্থল
মরণ শয়নে বধু শুয়েছে সুধীর।

বুকের ভিতরটায় যেন চাপ বোধ হ'তে লাগলো। আমি স্বামীর হাত আমার হাতের মধ্যে নিলাম। তার মত আমিও সুখী··· ভগবান! কত সুখী আমি। যে ক্ষুদ্র শিশু আসবে তা'কে মানুষ করবার জন্যে কি আমি থাকবো না—তা'কে হাত ধরে কি আমি চলতে শেখাবো না। ভগবান! যদিও তা সম্ভব হয় আমার যেন তা হয় না, কিন্তু তোমার ইচ্ছাই পূর্ণ হোক ঠাকুর।

ভিয়ার উঠলো।

—ধন্যবাদ তোর গলার স্বর হারিয়ে ফেলিস নি দেখছি। তুইতো আরোও গান জানিস, সেই 'সুন্দরী ইংবাজ" গানটা গা' না!

—দুঃখের বিষয় সে গানটা ভুলে গেছি ঐ পুরানো জুঁই ফুলের গানটাই কেবল মনে আছে।

ভিয়ার আমাদের দিকে এগিয়ে এলো। আমি তাকে ধন্যবাদ দিয়ে সমুদ্রের হাওয়া খেতে যাওয়ার ভান করে নিচে নেমে গেলাম--- কারণ আমি স্বামীকে জানতে দিতে চাইনা কত বিচলিত হ'য়েছি। নীচের উঠানে দু-এক পাক ঘুরে আমি শান্ত হ'য়ে তার কাছে ফিরে এলাম। কিছু পরেই চাকর ঘরে আলো দিয়ে গেল এবং ঘরের জানলা বন্ধ করে দিলে। ভিয়ার আটটার সময় চলে গেল,

যা'বার সময় বলে গেল সে রোজ আসবে আমাদের সঙ্গে দেখা করতে।

২৭ এ অক্টোবর

কাল রাত এগারটা পর্যন্ত আমি আমার মনের কথা লিখছিলাম। ভয় হ'লো পাছে বিছানায় শুইনি বলে লুই আমায় বকুনি দেয়। সে নিচে বসে রেজিমেণ্টের হিসাব নিকাশ করছিল। আজ বিকালে অনেকক্ষণ আমি ভগবানের কাছে প্রার্থনা করেছি। কিছু পরে লুই প্রবেশ করলো।

—এখনো টেবিলে! সে আমায় আলিঙ্গন করে বললে, তোমার যে অসুখ করবে।

তারপর সে আমার মাথার চুলের উপর অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে বললে :

তুমি কি সুন্দর মারগেরীৎ।

আমি হাসলাম।

—কাজ শেষ হ'লো ? সে জিজ্ঞেস করলে।

—এই মাত্র! আমি উত্তর দিলাম।

তারপর আমার খাতা বন্ধ করে, তার কাঁধের উপর হাত রেখে বললাম।

—লুই তুমি আমায় খুব ভালোবাসো নয় ?

—হাঁ, তাতো তুমি জানো। সে আমার কপালে চুম্বন করে বললে।

—আমিও তোমায় ভালোবাসি, বিশ্বাস করো ?

আপনা থেকেই আমার আঁখি জলে ভরে উঠলো।

—হ্যাঁ প্রিয়তম, আমি তোমায় বিশ্বাস করি।

—তা হ'লে আমার ভবিষ্যৎকে তুমি ক্ষমা করবে?

—ক্ষমা করবার তো কিছু নেই প্রিয়া।

আমি তাকে চুম্বন করলাম। আমায় সে অনেকক্ষণ বুকে ধরে রইলো। তারপর অভ্যাস মত আমরা ক্রুসিফিক্স-এর নীচে নতজানু হ'য়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করলাম।

২রা নভেম্বর

আমরা আমার মা বাবা'র চিঠি পেয়েছি। তাঁরা ন' তারিখে আসছেন। আমার ভারি আনন্দ। সরাদিন আমি কাটিয়ে দিলাম তাদের ঘর গোছ গাছ করতে। একা-একা সব কাজ করতে লুই আমায় বারণ করলে। কিন্তু আমি স্থির থাকতে পারছিনা দেখে সেও আমার সঙ্গে কাজে লেগে গেল। আমাদের মা-বাবা আসবেন সে জন্যে লুই খুব আনন্দিত।

মঁ: ভিয়ার আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। তাকে আমি বললাম—এক সপ্তাহের মধ্যেই মা বাবা এসে পড়বেন।

—তাদের সঙ্গে পরিচয় হ'লে আমার ভারি আনন্দ হ'বে। আপনার মা নিশ্চয় খুব ভালো মানুষ হ'বেন কারণ যে তার মেয়েকে এত ভালো করে মানুষ করতে পারে সে নিজে ভালো না হয়ে পারেনা।

—ভিয়ার, মেয়েদের মন রাখা কথা তো তুই বেশ বলতে পারিস,—লুই হাসতে হাসতে বললে।

—না না, মন রাখা কথা নয়। আমার যা ধরণা তাই বললাম।

খাওয়া দাওয়ার পর বুড়ী জাকো'র সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। বুড়ীর বয়েস আশী—একা। সে আমায় বড় ভালোবাসে তা'র কুঁড়ের ঢুকলে সে "ভগবান তোকে রক্ষে করুন" এই কথা বলে আমায় সম্বর্ধনা করে। আমরা কিছুক্ষণ কথা কই। মাঝে মাঝে এক বোতল মদ, না হয় কিছু ফল, না হয় ঝোল নিয়ে যাই তার জন্যে কারণ হতভাগী বুড়ী বড় দুর্বল। আজ যা'বার সময় লুই আর ভিয়ারের সঙ্গে দেখা হ'লো। লুই আমার দিকে এলো। সে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে।

—এত সকালে কোথা চলেছ ?

—বুড়ী জাকোর বাড়ী।

—আমি যা'বো তোমার সঙ্গে মারগেরীৎ, চল ভিয়ার সকলে মিলে বুড়ী জাকোর বাড়ী যাই। দুজন ভদ্রলোককে দেখে বুড়ী ভারি বিপদে পড়লো। তাকে এদের পরিচয় দিতে বুড়ি আমার স্বামীর করমর্দন করলে।

—তুমি বুঝি সৈনিক ? বেশ। আমার হতভাগা জোসেফও সৈনিক ছিল। সে আমার পুত্র কিন্তু সে ক্রিমিয়াতেই রয়ে গেছে। এই দেখ তার যা কিছু আমার কাছে আছে। দেয়ালে ঝোলানো একটা সৈনিকের পোষাক, ঘাড় ফিরিয়ে সে আমাদের দেখিয়ে দিলে। সে খুব সাহসী, আর বড় ভালো ছিল: তা'র পোষাকের মধ্যে কি খুঁজে পাওয়া গেসলো জানো ? আমার চিঠি আর মারী বোলেনের দেওয়া পদক। বুড়ী এই কথা বলে কাঁদতে লাগলো।

—আজ তিনি মাদাম তুস্যাঁ—মারীর আমি কথা বলছি। তিনি একজন ধনী হোটেলওয়ালাকে বিয়ে করেছেন। আমার হতভাগা

জোসেফ তাকে বড় ভালোবাসতো। যুদ্ধের শেষে সে মেয়েটীকে বিয়ে করতো। মোটের মাথায় মেয়েটীর মন ভালো। সে আমার দেখা শোনা করে। সে-ই তার স্বামীকে বলে কয়ে আমায় এই বাড়ীখানি কিনে দিয়েছে। সে প্রায়ই আসে আমার সঙ্গে দেখা করতে। এখন তার দু'টী সন্তান মেয়েটী বড় ভালো। হতভাগা জোসেফ!

এমনি ভাবে সে বহুক্ষণ কথা কইতে লাগলো। তার কাছ থেকে চলে আসবার সময় সে লুইয়ের করমর্দন করলে।

—ভগবান তো বিধবার প্রার্থনা শোনেন, আমি তোমার জন্যে আর তোমার মমতাময়ী স্ত্রীর জন্যে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবো যে-কটা দিন আমি এখানে আছি।

৯ই নভেম্বর

আমার বাবা ও মা এখন এখানে। কাল তাঁরা এসেছেন। আমরা দরজার কাছে দাড়িয়ে তাঁদের জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। পাচটার সময় বাগানের ফটকের কাছে একখানি গাড়ী এসে দাঁড়াল। আমরা ছুটে গেলাম। বাবা আমায় প্রথম দেখতে পেলেন।

— এই যে মারগেরীৎ… বাঃ তোর বেশ চেহারা হ'য়েছে তো।

মা তাড়াতাড়ি গাড়ী থেকে নেমে আমায় আলিঙ্গন করলেন। তার চোখে জল কিন্তু আনন্দাশ্রু। বাবা আমায় অনেক বার চুম্বন করলেন; আমি তার গললগ্ন হ'য়ে রইলাম।

—বাবা! আমার বাবা, কত দিন তোমায় দেখিনি।

—তুই সুখে আছিস মারগেরীৎ?

আমরা এ সব কথা চুপি চুপি কইতে লাগলাম। লুই আমাদের কাছে এসে হাসতে হাসতে জিজ্ঞেস করলে।

—কি মতলব করা হ'চ্ছে।

—না, তোমার সঙ্গে কত সুখে দিন কাটছে তাই বাবাকে বলছিলাম।

সে কিছু বললে না, কিন্তু তার মনের কথা আমি তার চোখ দেখে বুঝতে পারলাম।

—চল ভেতরে যাওয়া যাক, শেষ পর্যন্ত সে বললে, তোমার বাইরে থাকা উচিত নয় মারগেরীৎ।

আমি মা'কে তার ঘরে নিয়ে গেলাম। সেখানে তিনি একটী সোফার উপর বসে, আমার মুখখানি তার হাতের মধ্যে ধরলেন, কঁন্তেস দে প্লুয়ারভ্যাঁ আমায় ঠিক এমনি করে আদর করতেন। আমার চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়লো—এ-কি পরিতাপ!—না, কারণ আমার মুখে হাসি ফুটে উঠলো। মা আমার কপালে চুম্বন করলেন।

—তুই লুইকে এখন ভালোবাসিস, মারগো? তিনি চুপি চুপি আমায় জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ মা।

—সকলের চে' ?

—হ্যাঁ মা।

তিনি মিষ্টি হাসি হাসলেন। তাঁর দৃষ্টি আমার চোখের উপর নিবদ্ধ ছিল। তিনি আবার আমায় চুম্বন করলেন।

—তাঁর করুণার জন্যে আমার সঙ্গে তুই ভগবানের কাছে প্রার্থনা করবি?

—করবো মা, তা'তে আমার কত আনন্দ সে কথাতো তুমি জানো।

আমরা ভগবানের চরণতলে নত জানু হ'লাম।

আমি যখন বসবার ঘরে প্রবেশ করলাম—দেখলাম, লুই একা আগুনের কাছে বসে। আমি তার পিছনে এসে তার কাঁধের উপর হাত দিতে ত'বে সে আমায় দেখতে পেলে। সে আমার হাতের উপর হাত রাখলে এবং আমার দিকে মুখ তুলে চাইলে। অগ্নিকুণ্ডের আলোয় তার কপাল উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেছে এবং তার কটা অলোক-গুচ্ছ চক্ চক্ করছে—তার হাসি-মাখা চাহনি আনন্দোজ্জ্বল, আমি ঝুঁকে পড়লাম তাকে চুম্বন করবার জন্যে।

—তুমি একলা, বাবা কোথায়?

—উপরে তাঁর ঘরে।

তারপর সে উঠে বললে:

—ব'সো ওখানে; তুমি নিশ্চয় শ্রান্ত হ'য়ে পড়েছ—এই বলে জোর করে আমায় সোফার উপর বসিয়ে দিলে।

সে আমার পাশে বসলো, আমার হাঁটুর উপর মাথা রেখে। প্রায় পনের মিনিট আমরা সেখানে বসে ছিলাম। হঠাৎ কে দরজায় টোকা দিলে। প্রবেশ করলো মঃ ভিয়ার। আমাদের একা একা থাকতে দেখে সে আমাদের কাছ থেকে ক্ষমা চাইলে।

—এগিয়ে আয়, লুই তাকে হাসতে হাসতে বললে, তার দিকে একটা হাত বাড়িয়ে দিলে এবং তাকে আমাদের কাছে বসালে।

মঃ ভিয়ার বললে, সে জানে আমার বাবা এসেছেন।

—লেফ্যাব্র তোর কি হ'লো? অসুখ করেছে না কি?

—আমার? মোটেই না। আরাম করছি। দেখ যখন আমি ওর হাঁটুর উপর আমার মাথা রেখে শুই আর ওর আঙ্গুলগুলো যখন আমার মাথায় চুলের ভিতর ঘুরে বেড়াতে থাকে তখন আমার এত আরাম হয় যে কথা পর্যন্ত কইতে পারি না।

বাবা প্রবেশ করলেন। লুই উঠে তাঁর জন্যে একখানা চেয়ার আমার পাশে এগিয়ে দিল। আমি তাঁর সঙ্গে পরিচয় করে দিলাম মঃ ভিয়ারেরে—এবং মা'র আসার অপেক্ষায় আমরা কথা কইতে সুরু করলাম। তার পর সকলে নামলাম খাবার ঘরে।

১৮ নভেম্বর

পয়লা ডিসেম্বর আমরা নীস ছাড়বো কয়েক দিন পারীতে কাটিয়ে আমরা ফিরে যা'বো প্রিয় বৃটেনে: লুই ও আমার ইচ্ছা আমাদের সন্তান আমার দেশে জন্মায়। একদিন, তখন সন্ধ্যা, মা আর আমি বসবার ঘরে আগুনের কাছে বসে আছি, লুই ও বাবা বেরিয়েছেন। কিছুক্ষণ আমরা বৃটেন সম্বন্ধে নানা কথা কইলাম। আমি মা'কে জিজ্ঞেস করলাম কঁন্সেস কেমন আছেন।

—সেই এক রকম, অল্প মাথার দোষ! হায়রে হতভাগী!

—তার ভাই? তার কাছে রয়েছেন?

—হ্যাঁ, সে এখন সৈন্যদল ছেড়ে তারই দেখা-শোনা করবার জন্যে রয়েছে তার কাছে।

আমি স্বপ্নাবিষ্টের মত চিন্তা করতে লাগলাম। হঠাৎ মা বললেন:

—মারগেরীৎ, তুই মা হ'বি, না?

—হ্যাঁ মা—আমি হাসতে হাসতে লজ্জায় লাল হ'য়ে বললাম।

তিনি আমার হাত ধরে আমায় নিজের কাছে টেনে নিলেন আমি তাঁর বুকের উপর মাথা রাখলাম।

—কবে?

তা—জানি না—মা হাসা

—হ্যাঁরে, ছোট খাটো জিনিস-পত্র সব ঠিক করে রেখেছিস তো? তার আসবার সময় দরকার হ'বে—তিনি হাসতে হাসতে বললেন।

আমি তাকে আমার ঘরে নিয়ে গিয়ে, খোকার জন্যে লুই আর আমি যা কিছু কিনে রেখেছি সব দেখালাম। মা দেরাজের ভিতর থেকে সব কিছুই বার করে দেখতে লাগলেন।

—এক জোড়া ছোট জুতো! আরে এ-জুতো নিয়ে খোকা তোর কি করবে? ও বাবা! ভেলভেটের টুপি, সৈনিকের পোষাক! ও মারগেরীৎ। হাঁ এটা কাজে লাগবে—এই কথা বলে তিনি একটা ন্যাকড়া'র বাণ্ডিল বার করলেন। কিন্তু আরো অনেক কিছু যে তার প্রয়োজন হ'বে।

আমি হাসলাম।

—মা, তুমি আমার চেয়ে এ-সব বেশী বোঝো। তিনি আমার চুম্বন করলেন। আমাদের কাজে বাধা পড়লো লুই আর বাবার আওয়াজে। তারা বাড়ী ফিরলেন। আমরা নামছিলাম, সিঁড়িতে লুই-এর সঙ্গে দেখা হ'লো। মা তার করমর্দন করে নেমে গেলেন। লুই আমার দিকে ফিরলো।

—ব্যাপার কি মারগো? সে আমার কপালে চুম্বন করে বললে:

—আমাদের একটী সন্তান হ'বে, মা কি সে কথা জেনেছেন না কি?

—হ্যাঁ তিনি ত জানেন, বেশ আশ্চর্যের কথা নয়?

—আশ্চর্যের কথা কি আছে।

—তুমি সব তো তাকে বলেছ?

—না, না—

সে আমাদের ঘরে প্রবেশ করলো, আমিও তার সঙ্গে গেলাম।

—লুই, মা বলছেন ফেব্রুয়ারী'তে হ'বে—সত্যি ?

—হ্যাঁ—ভগবানের ইচ্ছা হ'লে তাই হ'বে।

আমি একটু চুপ করে থেকে বললাম—আমার ছেলে হ'বার সময় বৃটেনে থাকতে ইচ্ছে হয়।

মনে হ'য় আমার গলাটা একটু ভিজে উঠেছিল। জুঁই ফুলের গানের শেষ কলিগুলো আমার মনে পড়লো, লুই হঠাৎ মাথা তুলে আমায় চুম্বন করলে।

—নিশ্চয়—সে সময় তোমার মা'র চে' আর দেখাশোনা করবার লোক আর কে আছে।

মা নিশ্চয়ই বাবাকে এ সংবাদ দিয়েছিলেন, কারণ যখন নীচে নামলাম তখন বাবা আমায় আলিঙ্গন করে আমার মাথায় হাত রেখে বললেন।

—ভগবান আশীর্বাদ করুন—তোকে, তোর স্বামীকে আর তোর সন্তানকে।

লুইও কিছু পরে এসে আমাদের সঙ্গে যোগ দিলে। সন্ধ্যাটা ভারি আনন্দে কাটলো।

২০শে নভেম্বর

আজ আমরা সকলে ভিয়ারের চিত্রগৃহ দেখতে গেসলাম। সে আমাদের ছবিটা দেখাতে চাইলে, ছবিখানা প্রায় শেষ হ'য়ে এসেছিল। আমি বসে আছি লুইয়ের দিকে একটু অবনত হ'য়ে—লুই চিৎ হ'য়ে শুয়ে আছে আমার পায়ের উপর মাথা রেখে। এক হাতে করে সে আমার গলার পদক নিয়ে খেলা করছে। তার অধরে মৃদু হাসি—

আমায় যেন একটু গম্ভীর বলে মনে হ'চ্ছে—কিন্তু মুখে একটা আশার আলোক পরিস্ফুট হ'য়ে উঠেছে। ভিয়ার ছবিটার নাম দিয়েছে "প্রেমের স্বপ্ন"। বাবা অবাক হ'য়ে চেয়েছিলেন ছবির দিকে, মায়ের আনন্দ আর ধরে না। আমাদের ছবিটা ভালো লাগলো। কাল সকালে মঃ ভিয়ার পারী যাবেন। সে এসেছিল আজ আমাদের সঙ্গে খাবার জন্যে আর বিদায় নিতে।

৩০শে নভেম্বর

আমি বুড়ী জাকোর কাছে বিদায় নিতে গেলাম। আমরা বৃটেনে চলে যাচ্ছি শুনে বুড়ী মুষড়ে পড়েছিল। যখন আমরা তার ঘরে ঢুকলাম, দেখি একজন স্থূলকায় স্ত্রীলোক বসে রয়েছেন। তিনি আমাদের নমস্কার করে চেয়ার এগিয়ে দিলেন। ইনি হ'চ্ছেন মাদাম তুস্যাঁ।

কাল তুমি চলে যাচ্ছ? বুড়ী জাকো বিমর্ষ ভাবে বললেন। তোমার সঙ্গে যা'ক সৌভাগ্য। বুড়ী জাকো রোজ তোমাদের জন্যে প্রার্থনা করবে।

আমরা তার কাছ থেকে বিদায় নিলাম, তার হাতে দুটো স্বর্ণমুদ্রা গুঁজে দিয়ে। মারী বোলেন উঠে দরজা পর্যন্ত আমাদের সঙ্গে এলেন।

১০ই ডিসেম্বর ১৮৬১

আমরা পারীতে এসেছি। কাল আমরা এখান থেকে রওনা হ'বো। জুই-এর ইচ্ছে নয় যে আমি একবারে অনেক দূর ভ্রমণ করি কারণ তা'তে আমি পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়তে পারি। কাল আমার দিদিমা আমাদের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলেন। রোজ বিকেলে তিনি

আসেন আমাদের সঙ্গে এক সঙ্গে গাড়ী করে বেড়াবার জন্মে। আমি সকাল বেলা তাঁর বাড়ীতে যাই। তিনি আমায় বড় ভালোবাসেন। কাল মা আমার সঙ্গে আসতে পারেননি, সে জন্মে লুই আমার সঙ্গে এসেছিল এবং আমরাই তার সঙ্গে বেড়াতে গেলাম। বাবা গেললেন এক বন্ধুর বাড়ী। বুলঁই'এর বাগানে দিদিমা আমাদের নামতে বললেন। আমরা প্রায় এক ঘণ্টা চল্‌লাম, তার পর লুই আমায় গাড়ীতে উঠতে বল্‌লে।

—তুমি পরিশ্রান্ত হ'য়ে পড়নি? সে সঙ্কিত ভাবে জিজ্ঞেস করলে এবং আমায় তার লোমষ ওভারকোট দিয়ে ঢাকা দিয়ে দিলে।

—ছিঃ! আমি বুড়ী, আমি হাঁপিয়ে উঠিনি আর ঐ যুবতী মেয়েটা হাঁপিয়ে উঠলো!

—ওর এখন বেশী পরিশ্রম করা ঠিক হ'বে না। এই কথা বলে সে দিদিমার পিছনে পিছনে গাড়ীতে উঠলো। দিদিমা যেন কিছুক্ষণ কি ভাবলেন, আমার দিকে চেয়ে।

—ওঃ এতক্ষণে বুঝেছি, তিনি চিৎকার করে বল্‌লেন···সত্যি!

আমি হাসলাম।

—ঐ তো রং ফিরে এসেছে—আগেই আমার বোঝা উচিত ছিল বুড়ো হ'য়ে বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পেয়েছে।

তিনি আমায় প্রাণ ভরে আদর করলেন।

—যখন আমি ভাবি, তুই, সেই ছোট্ট মেয়েটা মা হ'বি, আর আমি এখনও বিয়ে করলাম না, তখন সত্যিই অবাক হ'য়ে যাই। তুই টা কবে আসছে!

—ফেব্রুয়ারী'তে দিদিমা।

—তা'লে এগিয়ে এসেছে বল ? সেই জন্যে তোকে এত ফ্যাকাশে দেখাচ্ছে···

—ছেলেতো যবর উত্তরাধিকারী হ'বে—আদর দিয়ে দিয়ে একবারে দফাশেষ করবি তো ?

এই সব কথা বলতে বলতে তিনি আমাদের দোরগোড়া পর্যন্ত এলেন।

৩০এ ডিসেম্বর

বৃটেন।—আমার প্রিয় দেশে এসে মন আনন্দে ভরে উঠলো। যেদিন আমরা পৌছাই সেদিন বরফ পড়ছে ; সারা দেশ যেন একটা সাদা চাদরে আববিত এবং চাঁদ তার উপরে রূপালী রং ছড়িয়ে দিয়েছে। লুই আমায় বেশ গরম করে জড়িয়ে দিয়েছিল—এবং বাবার কথা মত টুপি দিয়ে মুখটা পর্যন্ত ঢেকে দিয়েছিলাম। আমাদের জন্য গাড়ী অপেক্ষা করছিল—আমরা গাড়ীতে প্রবেশ করলাম। কালো ঘোঁড়া ছুটে চললো। থেরেস দরজায় দাঁড়িয়ে ছিল। সে আমায় তার বুকে জড়িয়ে ধরলো।

—নিজের ঘরে ফিরে এসেছিস!—সে আনন্দে আত্মহারা হ'য়ে বলে উঠলো।

লুই তার করমর্দন করলে। সকলে খাবার ঘরে ঢুকলাম সেখানে অগ্নিকুণ্ডের উজ্জ্বল আগুন আমাদের আহ্বান করলো উত্তপ্ত হ'য়ে নেবার জন্যে। থেরেস আমার ওভারকোট, বুট জুতো খুলে নিলে। আমায় আদর করে মা উপরে উঠে গেলেন। তার চোখে জল—আমাকে আবার তার পুরানো বাড়ীতে পেয়ে সে আনন্দে আত্মহারা। বাবা ও লুই গেল পোষাক বদলাতে।

থেরেস আমার পায়জামা এনে দিল—এবং আমার পা দুটো এগিয়ে দিল আগুনের কাছে। আমি তাকে ধন্যবাদ দিলাম। সে বললে :

—দিদিমনি তোমায় দেখে আমার ভারি আনন্দ হ'চ্ছে। দেখছতো আমি কত বুড়ী হ'য়ে গেছি। প্রায়ই ভাবতাম খুকী কি আর ফিরে আসবে না। তোর দেখা পেয়ে যেন আমার বয়েসটা দশ বছর পিছিয়ে গেল। আমার এখন মনে হ'চ্ছে, ক্ষুদে কর্তাটিকে এখনও মানুষ করতে পারবো। তোব মা য়ের ধাই-মা ছিলাম তোর ছেলের ধাই-মা হবো।

সে কথা কয়ে চললো আর আমি আনন্দ ভরে তার কথা শুনতে লাগলাম। আমাদের সন্তান! তার কথা ছাড়া এখন আমার আর কোন চিন্তাই নেই—ভগবানকে ধন্যবাদ। লুই আর আমি রোজই তার কথা কই। মা খোকাব কাঁথা তৈরী করছেন। আজ লুই নীসে'এ চলে গেল। প্রায় এক সপ্তাহ সে উপস্থিত থাকবেনা। তার ইচ্ছেটা আমার কাছে থাকবার জন্যে মাস দুই ছুটি নেয়। আমার স্বজনের কাছে বড়দিন কাটবে, এই ভেবে আমার মনে কি আনন্দ। আমরা সকাল আট-টার সময় গির্জায় গেলাম। গাঁয়ের সকলেই সেখানে জড় হ'য়েছিল। কত লোকের হাতেই না হাত দিলাম, কত আনন্দের কথাই না শুনলাম। কৃতজ্ঞতায় পরিপূর্ণ হৃদয়ে আমি দেবতার বেদীর তলে নতজানু হ'য়ে বসলাম। শিশু যেশুকে যেখানে গামলার ভিতর শুইয়ে রাখা হ'য়েছিল আমি সেখানে এগিয়ে গিয়ে নতজানু হ'লাম। আমি চিন্তা করলাম আমার আগত-প্রায় সন্তানের কথা। দয়াময়ী দেবী আমায় শক্তি দাও, আমার কর্তব্য পালন করবার শক্তি এবং সাহস দাও আমার সন্তানকে

মানুষ করে তোলবার। লুইও আমার কাছে নতজানু হ'য়ে ছিল। তারও চিন্তা আমারই মত।

মঃ ভালপয়েন ও তার উপযুক্ত স্ত্রী তাদের সন্তানদের নিয়ে এসেছিল। ক্লদ যেন বয়েসী লোকের মত গম্ভীর হ'য়ে আমার হাতে হাত দিলে। হেলেনের কিন্তু লজ্জা হ'লো আমায় দেখে—সে লজ্জায় লাল হ'য়ে তা'র মায়ের পিছনে লুকিয়ে রইলো। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সে আমার সঙ্গে কথা আরম্ভ করলে। হাত বাড়াতে ছোট পিয়্যার ছুটে এলো আমার কাছে, কাল কঁস্তেসের সঙ্গে দেখা করতে গেসলাম ; লুই আমার সঙ্গে গাড়ীতে এলো। আমি একলা বসবার ঘরে প্রবেশ করলাম। দ্রুনোয়ার বুড়ো চাকর আমায় দেখে চিৎকার করে উঠলো "মাদমোয়াজেল আরভ্যার"! সে আমায় সঙ্গে করে বসবার ঘরে নিয়ে গেল। কালোনেল দেস্ক্রে অগ্নিকুণ্ডের কাছে বসেছিলেন। তিনি কাগজ পড়ছিলেন সে জন্যে প্রথম আমায় দেখতে পেলেন না। আমায় দেখে তার ভগ্নী হঠাৎ নড়ে ওঠায় তিনি আমার দিকে মুখ ফেরালেন।

—দ্রুনোয়া যে দেশে আছে ও সেই দেশ থেকে ফিরছে—ও তার খবর এনেছে আমার জন্যে—কস্তেস, এই কথা বলে আমার কাছে এগিয়ে এসে আমার হাত ধরলেন এবং আমার দিকে হাসি মুখে চাইলেন তারপর তিনি আমায় অগ্নিকুণ্ডের কাছে নিয়ে গেলেন।

—সে কেমন আছে বাছা? শীগ্‌গির সে আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে তো?—উত্তর দিচ্ছিস না কেন? দু-একটা কথাও অন্তত বল—এমন করে চুপ করে থাকলে মারা পড়বো যে।

—হ্যাঁ—রে, সে তার ভাইকে হত্যা করেছে, একথা সত্যি নয়—নয়? তিনি চুপি চুপি জিজ্ঞেস করলেন। কলোনেল তাকে ধরে নিয়ে গেলেন সোফার কাছে।

—শুয়ে পড় বন, তোমার অসুখ।

তিনি হাসলেন এবং শুয়ে পড়লেন। কলোনেল আমার কাছে এসে বসলেন। তিনি বললেন যে কঁস্তেসের শরীর দিন দিন ভেঙ্গে পড়ছে।

—আর বেশী দিন নয়—দেখছিস তো কি রকম রোগা ও বুড়ী হ'য়ে গেছে।

—সত্যি—তাকে দেখে আমার চোখে জল এলো।

—তুই সুখীতো ?—কলোনেল জিজ্ঞেস করলেন।

—হ্যাঁ—আমি তাঁর পানে চাইলাম।

—ভগবান মঙ্গলময়, এই তোর পুরস্কার।

ছুটি নিয়ে চলে আসবার সময় কঁস্তেস উঠে আমায় আলিঙ্গন করলেন। কলোনেল আমায় গাড়ী পর্যন্ত পৌছে দিলেন। তিনি লুইয়ের করমর্দন করে বললেন :

—আপনি ওকে সুখী করতে পেরেছেন—সে জন্যে আমি ভগবানকে ধন্যবাদ দিচ্ছি কারণ কেবল একমাত্র তিনিই জানেন মাদমোয়াজেল সুখ পাবার কত সুযোগ্য পাত্রী।

আজ মাদমোয়াজেল গোসেরেল এসে ছিল দেখা করতে—তার সঙ্গে একটি বয়সী ভদ্রলোক। বসবার ঘরে সোফার উপর আমি একা বসেছিলাম, সে সেখানে ছুটে এসে আমায় জড়িয়ে ধরলে। তার সঙ্গী মঃ লাকোস্ত-এর পরিচয় করিয়ে দিলে সে আমার সঙ্গে।

—ইনিই আমার ভাবী মারগেরীৎ; আমার কাছে লুকোচুরি নেই— দেখছিস তো আমি তোর মতনই। এবং হাসতে হাসতে বললে।

—ইনি মস্ত বড় ধনী ব্যক্তিও।

আমি মঃ লাকোস্ত-এর দিকে চেয়েছিলাম। সে আবার বললে :

—আমি যেমন আছি তেমনি উনি আমায় নিচ্ছেন। উনি জানেন আমি ওকে কত ভালোবাসি—তবে সোনার টাকার তোড়াগুলোও অবশ্য আমার ভালো লাগে—নয় রিশার? মাদমোয়াজেল গাসেরেল শেষে গম্ভীর ভাবে আরম্ভ করলে :

—কিন্তু মারগেরীৎ তুই তো এখনও শরীরের বল ফিরে পাসনি। যখন ঘরে ঢুকে তোকে সোফার উপর দেখলাম মনে হ'লো একটু রক্তহীন।

লজ্জায় আমার গাল দুটো একটু লাল হ'য়ে উঠলো।

—শরীর ভালই আছে—ধন্যবাদ।

—কিন্তু লেফ্যাব্র কোথা?

—নীসে।

—সেখানে বুঝি তার সৈন্যদল রয়েছে?

—হ্যাঁ।

—দেখছ তো সৈনিককে বিয়ে করায় কি অসুবিধে। তারা প্রায়ই বাড়ীতে অনুপস্থিত থাকতে বাধ্য হয়···তার পর যুদ্ধের সময়···

—এখন তো যুদ্ধ নেই···এখন কিছুকাল যুদ্ধ হ'বেও না। তার পর গর্বিত ভাবে বললাম—সৈনিক দেশ রক্ষা করে—সে যাই হোক দেশ সেবক তাতে তো সন্দেহ নেই।

—শুনছো, কি রকম স্বামীর দিক নিচ্ছে। কিন্তু কবে লেফ্যাব্র ফিরবে?

—এক সপ্তাহের মধ্যে। মাস তিনেকের ছুটির জন্যে গেছে।

—যা'তে সুন্দরী স্ত্রীর কাছে দিন কাটাতে পারে, নয়? আশা করি সে ছুটি পাবে।

গোগেরেল উঠে যা'বার সময় আমায় নিমন্ত্রণ করলে তার বিয়েতে যা'বার জন্যে।

—পারীতে, ২৭শে ফেব্রুয়ারী; আসবি তো?

—যদি পারি।

—মানে? স্বামীর অনুমতি যদি পাই, কেমন! সে হাসতে হাসতে বললে—বলে কয়ে অনুমতি নিয়ে যাস—তোর ঐ গোলাপের মত লাল অধরের একটী চুম্বনের পরিবর্তে সে সব কারতে পারে।

৮ই জানুয়ারী

নতুন বছর! লুই আজ ফিরে এসেছে—পকেটে করে তিন মাসের ছুটি নিয়ে। মনে হ'লো যেন কতদিন তাকে দেখিনি। আমি বসবার ঘরের দরজায় তার জন্যে অপেক্ষা করছিলাম। বাবা আমার নীচে নামতে মানা করে দিয়েছেন, কারণ ভীষণ ঠাণ্ডা বাইরে। অনেক দূরে থাকতেই আমি লুইকে দেখতে পেলাম ঘোড়ার উপরে। সে তাড়াতাড়ি উপরে উঠে এসে আমায় জড়িয়ে ধরে চুম্বন করলে। বাবা উপরে উঠছিলেন।

—বাইশ বছর বয়েসে কি কেউ বুঝতে পাবে ভালোবাসা কি? তিনি হাসতে হাসতে বললেন।

লুই একটু লজ্জিত হ'যে তাঁব দিকে ফিরে করমর্দন করলে। বাবা তার কপালে চুম্বন করলেন।

—আমি তোমায় পেয়ে ভারী সুখী লুই,—ছুটি পেয়েছ?

—হ্যাঁ, তিন মাসের।

বাবা বসবার ঘরে প্রবেশ করলেন আমায় আদর করে। লুই

আমাদের ঘরে প্রবেশ করলো ভ্রমণের পোষাক ছাড়বার জন্যে—আমিও গেলাম তার পিছু পিছু।

—আমার কর্নেল বড় ভালোলোক—লুই বললে। আমি অগ্নিকুণ্ডের নিকট তার পায়ের কাছে বসলাম। সে আমার মাথার চুলের মধ্যে অঙ্গুলি সঞ্চালন করতে করতে বললে :

—যখন তাকে বললাম আমার ছুটির দরকার। সে আমার কারণ জিজ্ঞেস করলে, আমি যখন তাকে বললাম সাংসারিক কারণ, সঙ্গে সঙ্গে তিনি ছুটির হুকুম দিয়ে দিলেন।

মাদমোয়াজেল গোসেরেল যে আমাদের নিমন্ত্রন করে গেছে সে কথা আমি তাকে বললাম। সে হেসে বললে :

—তুমি তো যেতে পারবে না, আমিও না—কারণ তার আসবার সময় হ'য়েছে। সে ঝুঁকে পড়ে আমার কপালে চুম্বন করলে।

১১ই জানুয়ারী ১৮৬২

গেল পরশু রাত্রে আমি এক ভীষণ দুঃস্বপ্ন দেখে ভয় পেয়ে জেগে স্বামীর দিকে চেয়ে রইলাম। অগ্নিকুণ্ডের কম্পমান শিখার আলো তার মুখের উপর পড়েছে। কি নিশ্চিন্ত মনে সে নিদ্রা যাচ্ছে। আমার দুই গাল বয়ে ঝরে পড়লো দুই ফোটা অশ্রু। ভগবান কি আমার মৃত্যু চাইবেন—এইতো মোটে সুখের জীবন সুরু হ'য়েছে। আমি ঝুঁকে পড়ে ধীরে ধীরে স্বামীকে চুম্বন করলাম। সে ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে বললে "আমার ছোট্ট প্রিয়া"—এবং আমার গলা জড়িয়ে ধরলে দুহাত দিয়ে; আমি তার কাছে ঘেঁসে শুলাম কিন্তু অনেকক্ষণ জেগে রইলাম। স্বপ্নের স্মৃতি আমায় বড় কষ্ট দিচ্ছিল।

কাল বিকেলে লুইকে আমি আমর স্বপ্নের কথা বললাম। তখন

রাত্রি দশটা, আমি জানলার কাছে শোবার পোষাক পরে বসেছিলাম। জানলার পর্দা সরালাম। চাঁদের আলোয় চারদিক ঝকমক করছে। পনের মিনিট পর লুই প্রবেশ করলো। সে আমার কাছে এসে আমার কপালে চুম্বন করলে। আমি উঠে দাঁড়ালাম ; কিছুক্ষণ আমরা দুজনেই জানলার কাছে দাঁড়িয়ে রইলাম—গাছ থেকে খসে পড়া শুকনো পাতার দিকে চেয়ে। পাতাগুলো প্রজাপতির মত উড়তে উড়তে এসে জানলার শার্শিতে লাগছিল। হঠাৎ আমি বললাম :

—লুই, গাছে গাছে আবার যখন ফুল ফুটে উঠবে তখন আমি আর থাকবো না। তখন আমার স্থান হ'বে ঐ শীতল সবুজ ঘাসে ভরা ভূমির তলে।

—ভগবান যেন তা না করেন—কথাটা যেন তার মুখ থেকে আপনা থাকতে বেরিয়ে গেল। কিছু পরে, আমি শুনতে পেয়েছি ভেবে, সে হাস্যোচ্ছল ভাবে বললে।

—কি যে বলো তার ঠিক নেই। তুমি এখন দুর্বল—তার উপর প্রসবের সময় এগিয়ে আসছে আর সেই কথাই দিন রাত ভাবছো। কাল আবার তুমি একলা ছিলে। আমার অনুপস্থিতিতে চিন্তা করে করে মাথাটা খারাপ করেছ আর কি।

সে আমার পানে চেয়ে রইলো। তার মুখে হাসি। সে আমায় নিশ্চিন্ত করবার চেষ্টা করলে। চাঁদের আলো তার মুখের উপর এসে পড়েছিল।

—তা হ'বে লুই—কিন্তু স্বপ্ন দেখে আমি ভয় পেয়ে গেসলাম।

—তুমি আমায় জাগালে না কেন? তোমার এ-অবস্থায় ভয় পাওয়া ভালো নয় তো।

—তুমি তখন শান্তিতে নিদ্রা যাচ্ছিলে সে জন্যে তোমায় জাগাতে ইচ্ছে হ'লো না, আমি তোমার কাছ ঘেঁসে শুলাম। তুমি আমায়

জড়িয়ে ধরে বললে, "আমার ছোট্ট প্রিয়া—তাইতেই আমি সাহস পেলাম।

সে উৎফুল্ল ভাবে বললে :

—তোমার স্বপ্নটা আমায় বলো। স্বপ্নটা নিশ্চয় ভীষণ কিছু হ'বে, না হ'লে তুমি তো ভয় পাবার মেয়ে নও।

—তোমার তো যথেষ্ট সাহস আছে মারগেরীৎ।

—আমি দেখলাম—একা বিছানায় ঘুমোচ্ছি—হঠাৎ কে জানলায় ঘা দিলে। আমি জেগে উঠলাম—ভীষণ দুর্বল মনে হ'লো—ভয়ও হ'লো সেই সঙ্গে। আমি ঘরের দরজা খুলতে সাহস করলাম না যখন বাবা আমার পাশের ঘর থেকে বললে :

—দরজা খোল মারগেরীৎ তোর স্বামী এসেছে।

আমি উঠে দরজা খুললাম। কেউ কোথাও নেই। আমি বসবার ঘরে নামলাম—ভাবলাম তুমি সেখানে আছো। সত্যিই তুমি সেখানে ছিলে দরজার দিকে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে। আমি তোমার কাছে গিয়ে তোমার বুকে মাথা রাখলাম। তুমি আমায় জড়িয়ে ধরলে কিন্তু তোমার মুখ অন্য দিকে ফেরানো ছিল—আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না তোমার মুখ। তোমার দিকে চোখ তুললাম। তুমি মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে চাইলে। হে ভগবান! দেখলাম সে মুখ তো তোমার নয়—! সে যে মৃত্যুর মুখ!—আমার ঘুম ভেঙ্গে গেল।

সে মন দিয়ে আমার কথা শুনলে। আমার কথা শেষ হ'লে বললে :

—চেয়ে দেখ দেখি—আমার মুখখানা কি মৃত্যুর মত?

—না, তা-কেন হ'বে। সত্যিই তার মুখ দেখে মনে হ'লো যেন জীবনের প্রতিমূর্তি। তার আশা ও কোমলতা ভরা চোখ, তার

অসীম প্রেমে ভরা হাসি—সুখালোক উদ্দীপ্ত মুখমণ্ডল—আমার সব ভয় উবে গেল। আমি তাকে চুম্বন করে বল্লাম।

আমার স্বপন রঙ্গীন হলো
তোমার দিঠির আলোক লেগে।

সে হাসলো—আমায় উদ্দেশ্য করে বল্লে?

তারপর সে গম্ভীর কণ্ঠে বললে।

—তারপর প্রিয়া, তুমি কি মনে করো—যে-সুখের জীবন আমাদের মাত্র আরম্ভ হ'চ্ছে তা ভগবান কেড়ে নেবেন? না, মারগেরীৎ—ভগবান, যে এত দয়াময় সে কখন তা পারে।

আমি উত্তর দিলাম না। কে জানে! ভগবান সবই আমাদের ভালোর জন্যে করেন—আমাদের মনে হয় ঠিক বিপরীত।

———

শেষ কথা

তার প্রসব হ'লো ১৪ই ফেব্রুয়ারী। মা বাড়ী ছিলেন না। বাবাও মা'র সঙ্গে গেসলেন এক পুরাতন পীড়িত বন্ধুর সঙ্গে দেখা করতে। বন্ধুর বাড়ী প্রায় তিন মাইল দূরে। মা যেতে চাননি কিন্তু মারগেরীৎ বল্লে, সে ভালো আছে, এবং বার বার মা'কে যাবার জন্যে বল্লে। বিকেল চারটের সময় তার ব্যথা আরম্ভ হ'লো। সে স্বামীর সঙ্গে বসবার ঘরে বসে ছিল। তার স্বামী পাশে বসে লিখছিল আর মারগেরীৎ বুনছিলো। কয়েক মিনিট পরে সে সোফার উপর শুয়ে পড়লো। স্বামী তার দিকে ফিরে চাইলেন

—কি হ'লো?

—কিছু না। একটু দুর্বল বোধ করছি।

স্বামী তার কাছে এসে বসল। সে সঙ্কাকুল। কিন্তু তার ইচ্ছা নয় যে তার স্ত্রী সে কথা বুঝতে পারে। মারগেরীৎ তার ছোট হাতখানি স্বামীর হাতের মধ্যে রাখলে। লুই তার কপালে চুম্বন করলে। কিছুক্ষণ সব চুপ-চাপ। শেষ পর্যন্ত মারগেরীৎ বললে:

—লুই আমি উপরে আমার ঘরে চললাম। বেশ ভালো বোধ হ'চ্ছে না।

সে উঠলো। তার মনে হ'লো যেন সারা ঘরখানা ঘুরছে তার চার দিকে। সে আবার বসে পড়লো।

লুই তাকে তুলে নিয়ে নিজেদের ঘরের একখানি হেলান চেয়ারের উপর শুইয়ে দিলে।

—এই খানে চুপ চাপ একটু শুয়ে থাকো—আমি তোমার মা'র খোঁজে লোক পাঠাই আর ডাক্তারের কাছে চিঠি পাঠাই ঃ

লুই চলে গেল এবং থেরেসকে মারগেরীতের কাছে পাঠিয়ে দিলে। থেরেস, উত্তেজনায় কম্পমান অবস্থায় মারগেরীতের পোষাক ছাড়িয়ে দিলে।

এইবার সে আসছে—আমার ছেলে, নয় থেরেস ?

—হ্যাঁ, মা।

থেরেস তা'কে তার শোবার পোষাক দিতে যাচ্ছিল। মারগেরীৎ বল্‌লে হাসতে হাসতে।

—সব চে সুন্দর গাউনটা দে আমায়—একটী নতুন লোক আজ আমার সঙ্গে দেখা করতে আসবে।

তিন কোয়াটার কেটে গেল। ব্যথা বেড়েই চলেছে; বেদনায় চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়লো। ঝি চলে গেল গরম জল আনবার জন্যে। মারগেরীৎ মুখে হাত চাপা দিয়ে জানলার কাছে বসে রইল। শিগ্রই তার স্বামী ফিরে এল। তার মুখ থেকে হাত সরিয়ে দিয়ে দেখলেন-তার চোখ দিয়ে জল ঝরে পড়ছে।

—তুমি এত ছেলে মানুষ—এই কথা বলে সে তার কপালে চুম্বন করলে। তার পর জিজ্ঞেস করলে।

—বড় কষ্ট হ'চ্ছে—খুব ?

—বেশী নয়, সে বললে, মুখে হাসি ফুটিয়ে তোলবার চেষ্টা করে।

মারগেরীৎ বুঝতে পারলে স্বামী শঙ্কিত হ'য়েছেন। সে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললে। মারগেরীৎ বললে।

—ছেলেকে কোলে পেলে আমি সব ভুলে যা'বো। এত বড় পুরস্কার পেতে হ'লে এক কষ্ট করতে হ'বে বইকি।

স্বামীর উপরে ভর দিয়ে সে তা'র বিছানায় গিয়ে শুয়ে পড়লো। ছ'টা বাজলো—সাড়ে ছ'টা বাজলো। লুই ব্যস্ত হ'য়ে পড়লো ডাক্তারের জন্যে। লুইকে উঠতে দেখে মারগেরীৎ তার গলা জড়িয়ে ধরে বলে উঠলো।

—লুই, আমায় একলা ফেলে যেওনা—তুমি যেওনা।—আমার ভয় করছে।

চুপ কর—ভয় কি।

লুই তার বিছানার কাছে নতজানু হ'য়ে বসলো।

মারগেরীৎ তার গললগ্ন হ'য়ে তার কাঁধে মাথা দিয়ে রইলো। তার দুই চোখের জল দেখলে বেশ বুঝতে পারা যায় তার কত কষ্ট হ'চ্ছে। সাতটা বাজলো মারগেরীৎ একটী গভীর দীর্ঘশ্বাস ফেলে অচৈতন্য হ'য়ে পড়লো—একটী শিশুর জন্ম দিয়ে। সেই সময় বাড়ীর দরজায় একখানি গাড়ী এসে দাঁড়ালো—মা ফিরলেন। তিনি ঘরে প্রবেশ করতে লুই উঠে তার স্ত্রীর মাথা, বালিসের উপর রেখে এগিয়ে গেল মা'র কাছে।

—প্রসব হ'য়ে গেছে—ও অচেতন হ'য়ে পড়েছে। এই কথা বলে লুই বেরিয়ে গেল। দশ মিনিট পর ডাক্তার এসে প'ৌছলেন। কাপিত্যান তা'কে সঙ্গে করে বসবার ঘরে নিয়ে এলেন। তিনি ডাক্তারকে সব বললেন। শেষে বললেন:

—মা তার কাছে আছেন।

ঘরের দরজা খুলে মাদাম দারভ্যার মঃ সান্তোর খোঁজ করতে এলেন।

—এখন আপনি আসতে পারেন। একটী সুন্দর ছেলে হ'য়েছে।

ডাক্তার আর লুই ঘরে প্রবেশ করলেন। মারগেরীৎ বিছানায় নিশ্চল হ'য়ে শুয়ে আছে চোখ দুটী বুজে। ডাক্তার তার নাড়ী দেখলেন। ডাক্তারের বহু চেষ্টা সত্ত্বেও মারগেরীৎ আধ ঘণ্টা পর চোখ খুললো। প্রথম দৃষ্টি পড়লো তার স্বামীর দিকে—তার উপরে ঝুঁকে রয়েছেন শঙ্কিত মুখে। মারগেরীৎ মৃদু হাসলো তাকে সাহস দেবার জন্যে। লুই তার কপালে চুম্বন করলো।

—খোকা! কোথা সে? মৃদু স্বরে মারগেরীৎ জিজ্ঞেস করলে।

মাদাম দারভ্যার খোকাকে তার বাপের হাতে তুলে দিলেন—লুই খোকাকে তার মায়ের কোলে দিল। মারগেরীৎ পুত্রের মুখের পানে চেয়ে দেখলে, তার মুখে মধুর হাসি ফুটে উঠলো—সে শিশুর কপালের উপর চুম্বন করলে।

—এই আমাদের পুত্র—আমাদের চির অভিপ্সিত পুত্র।

তারপর সে মিষ্টি হাসি হেসে বললে—

—তুমি পিতা হ'য়ে খোকাকে চুমু দিলে না?

লুই নতজানু হ'য়ে, খোকাকে ও তার মা'কে চুম্বন করলে।

—ভগবান্ আমার স্ত্রীকে ও আমার পুত্রকে আশীর্বাদ করুন—এবং তাদের রক্ষা করুন।

লুই উঠে দাঁড়াতে মঁঃ শাস্তো তার হাতে একটী কাঁচের গ্লাস দিলেন।

—ওকে সবটা খাইয়ে দাও।

মারগেরীৎ উঠে বসতে যাচ্ছিল—

—তুমি চুপ করে শুয়ে থাক মা—তুমি এখন বড় দুর্বল।

গ্লাসের ওষুধ সে একটুখানি পান করে বললে—

—আমি খেতে পারব না লুই।

—খেতে হবে মারগেরীৎ।

মারগেরীৎ তার কথ শুনলো—

—যত পার, বরন বেশী করে খাও, আর পান কর, তা না হ'লে কি করে তুমি ওকে মানুষ করবার মত শক্তি পাবে? ঐ রকম বড় সড় ছেলে তো আর একটুতে সন্তুষ্ট হবে না, সে কথা কিন্তু বলে রাখছি।

ডাক্তার পাশের ঘরে গিয়ে ঢুকলেন।

—তারপর! লুই উদ্বিগ্ন হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে।

উত্তরে ডাক্তার একবার মৃদুভাবে শীষ দিলেন।

—বলুন ডাক্তার, লুই অস্থির এবং উদ্বিগ্ন হ'য়ে বললে।

ডাক্তার লুইয়ের বাহুর উপর হাত রাখলেন।

—দেখ বন্ধু. একটু শান্ত হও। মারগেরীৎকে আমি জন্ম থেকে দেখে আসছি। আমি জানি ওর স্বাস্থ্য সুন্দর এবং সুদৃঢ়; এইটেই যা সুখের বিষয়। তার উপর সে যুবতী—মাত্র সতের বছর বয়েস—এটা ওর পক্ষে ভালো এবং মন্দ দুই-ই। একদিকে, মা হ'বার মত বয়েস ওর হয় নি—অন্য দিকে যুবতী অবস্থায় শক্তি থাকে। সুতরাং ও দুর্বলতার বিরুদ্ধে ও রোগের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে জয়ী হ'তে পারবে। ও কি আগের মত বলবান আছে?

—আমাদের বিয়ের আগে, এপ্রিল মাসে ওর যে জ্বর হয়েছিল সেই থেকে ও দুর্বল ও শীর্ণ হ'য়ে গেছে, তা তো আপনি জানেন ডাক্তার, তারপর মে মাসে আমাদের বিয়ে হ'লো।

—বুঝতে পারছি। স্বাস্থ্য ও সম্পূর্ণ ফিরে পায় নি। তার ছোট ছোট চোখের অন্তর্ভেদী দৃষ্টি লুইয়ের শঙ্কাকুল মুখের উপর নিবদ্ধ হ'য়ে রইলো।

—ভয় নেই—সেরে উঠবে। ও যুবতী, এই যথেষ্ট—

তারপর ডাক্তার মিষ্টি সুরে বল্লেন।

—চিন্তা করো না ভয়ের কিছু নেই। তার পূর্ণ যুবতী অবস্থার উপর আমার যথেষ্ট বিশ্বাস আছে।

তারা আবার ঘরে ঢুকলেন। মারগেরীৎ দরজার দিকে ফিরে চাইলো এবং তার স্বামীকে প্রবেশ করতে দেখে তার মুখে হাসি ফুটে উঠলো।

—কেন চলে গেসলে? বসোনা এখানে।

সে লুইকে তার কাছে একটু জায়গা করে দিলে। লুই বসলো সেখানে।

সে স্বামীর হাত নিয়ে শিশুকে স্পর্শ করিয়ে দিয়ে বললে।

—যেন বরফের মত নরম, নয়?…কত বড় হ'য়েছে দেখছ একবার! মা বললেন লোকে দেখলে বলবে ছ'মাসের ছেলে। চোখ দুটো দেখছ ঠিক তোমার মত চকচকে আর গভীর। ছোট্ট মানুষটী আবার সব সময় চোখ খোলেন না। চুলগুলো দেখছ?

—তোমার মত কালো।

—কিন্তু ওকে দেখতে তোমার মতো।

—আমার প্রশংসা করা হ'চ্ছে বুঝি।

—সত্যি বলছি আমার মা'কে জিজ্ঞেস করো। নয় মা? খোকাকে দেখতে ঠিক লুই-এর মত নয়?

—কিন্তু অত চালাক নয়—ডাক্তার এই বলে তার কাছে এগিয়ে এসে বিদায় নিয়ে বললেন:

—ঘুমোবার চেষ্টা করো।

খোকা চিৎকার করে উঠলো। মা শঙ্কিত হ'য়ে তার পানে চাইলো। তার পর জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে ফিরতে ডাক্তার বললেন:

—ওর হয়তো ক্ষীদে পেয়েছে।

—দুধ দাও ওকে।

আনন্দে মারগেরীৎ লাল হয়ে উঠলো।

—কিন্তু দেখো, খালি খালি খাওয়াবার জন্যে যেন ঘুম ভেঙ্গে উঠে পড়ো না, তা হ'লে অসুখে পড়বে।

ডাক্তার বেরিয়ে গেলেন। ঘরের সব আলো নিভিয়ে দেওয়া হ'লো—জেগে রইলো কেবল একটী মৃদু আলো আর অগ্নি কুণ্ডের কম্পমান দীপ্তি। শিশু স্তনপান করাছল—যুবতী মা তার পানে চেয়ে ছিল আনন্দ আর গর্বভরে। এক বর্ণনাতীত আনন্দ তার শরীরের সমস্ত রক্ত তার দুই গণ্ডে সঞ্চারিত করছিলো যখন সে প্রথম অনুভব করলে, তার ক্ষুদ্র শিশুর অধরের চাপ তার স্তনের উপর। স্বামী তার কাছে বসে, যুবতী স্ত্রীর কাঁধের উপর হাত রেখে তার আনন্দময় মুখের দিকে চেয়ে ছিল।

সেই সময় জেনেরাল প্রবেশ করলেন। তিনি মারগেরীতের কাছে এসে বললেন—আমি তা হ'লে দাদু হ'লাম বল। না না না, তোমায় উঠতে হ'বে না, তুমি বসো—বললেন তিনি লুইকে উঠতে দেখে।

তিনি কন্যার কপালে চুম্বন করলেন।

—ভগবান তোকে আশীর্বাদ করুন, তারপর, তুই এখন কেমন আছিস বল? খুব দুর্বল নয়?

—একটু বাবা—কিন্তু বাবা তুমি তো তোমার নাতিকে দেখতে চাইলে না?

—আমার নাতি—জেনেরাল বললেন—কি বলিস্‌রে হ্যাঁ—আমি এর মধ্যে দাদামশাই হ'য়ে গেলাম। জানলে কখনও লুইকে, তোকে বিয়ে করতে দিতাম না—বলিস কি! ষাট বছর বয়েসের আগেই

এই অপমান! এভাবে চললে তো শীগ্‌গিরই প্রমাতামহ হ'য়ে যা'বো।

মারগেরীৎ হাসতে লাগলো—তার রূপালী হাসি দেখলে মন স্বতঃই আনন্দে ভরে ওঠে। সে তার স্বামীকে তিনটী বাতি জ্বালতে বললে—

মাতামহ অনেকক্ষণ সেই ঘুমন্ত মূর্তিটার দিকে চেয়ে রইলেন। তার মনের মধ্যে জেগে উঠলো তার যুবক বয়েসের স্বপ্ন—মনে পড়লো তার সে দিনের আনন্দের কথা, যে দিন সে প্রথম তার কন্যাকে বুকে তুলে নিয়েছিল। সেই সাদা মশারী ঝোলানো বিছানা, যা'র উপর তার স্ত্রী শিশুকে কোলে করে তারই পাশে বসে ছিল—আজ যেন সে-ছবি তার চোখের সামনে দেখতে পেলে। আনন্দে তার বুক ভরে উঠলো। সে ঝুঁকে পড়ে শিশুকে চুম্বন করে বললে:

—আজকের দিনটা আমার মনে পড়িয়ে দিল তোর জন্ম দিনের কথা। কিন্তু তোর মা ছিল তোর চে স্বাস্থ্যবতী—তুই তো একেবার সাদা আর দুর্বল। তবে তার বয়েস তোর মত কম ছিলনা।

—কত বয়েস ছিল মা'র, বাবা?

—পঁচিশ।

—তা'লে মা লুইয়ের চে' বড় ছিল বল।

—কত বয়েস ওর! দাঁড়া ১৮৪০ থেকে ১৮৬২—ওর বয়েস তো বাইশ।

তারপর সে হঠাৎ বললে:

—আরে! লুই—তোমার তো আজ জন্মদিন।

—ছি-ছি-ছি···দেখতো লুই, সে-কথা বাবা বলতে তবে আমার মনে পড়লো।

—কিন্তু বাছা—তুমি তো খুব ভালো উপহার দিয়েছ ওকে আজ।

মারগেরীৎ আনন্দে হাসতে লাগলো।

—এরচে, ভালো উপহার কি হ'তে পারে বলুন?—লুই বললে শিশুকে চুম্বন করে।

মারগেরীৎ তার স্বামীর হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে চুম্বন করলেন। কিছু পরে সে বললো:

—লুই, দিদিমাকে তার করা হ'য়েছে?

—সে কথা তোকে ভাবতে হ'বে না—এই মাত্র আমি তার করে আসছি। তোর এখন একটু বিশ্রাম করা প্রয়োজন। কা'ল আবার আমরা গল্প করবো, ঘুমো এখন। এই কথা বলে জেনেরাল তার কন্যার কপালে চুম্বন করে চলে গেলেন।

পরের দিন সকালে মারগেরীৎ সকলের অনেক আগে জেগে উঠলো। লুই সারা রাত ঘুমোতে পারেনি। শরীর যে তার খারাপ ছিল তা নয়, তার মন হয়েছিল উদ্বিগ্ন। বিছানার দিকে পিছন ফিরে সে অগ্নিকুণ্ডের কাছে দাঁড়িয়ে ছিল। চিন্তায় বিভোর হ'য়ে সে একদৃষ্টে আগুনের দিকে চেয়ে সেই সময় তার প্রিয়তমা মিষ্টি সুরে তাকে বললে:

—লুই।

লুই ফিরলো। মারগেরীৎ তার দিকে চাইলো তার বড় বড় বিশ্বাস ভরা কালো চোখ তুলে। তার চোখের ভিতর থেকে যেন বিকীর্ণ হ'চ্ছে মৃদু ও কোমল আলোক-রশ্মি। লুই তার কাছে এগিয়ে এসে কপালের উপর চুম্বন করলো।

—তুমি ঘুমোও নি লুই?

—আমার ঘুমের প্রয়োজন নেই,—সে হাসতে হাসতে বললে।

—নিশ্চয় আছে, অসুখে পড়বে যে স্বাস্থ্যের দিকে নজর না দিলে

—কিছু ভয় নেই তোমার সেজন্যে। তুমি কেমন আছ বলো ?

—সিংহীর মত বলবান—আমার ভীষণ আনন্দ হ'চ্ছে লুই।

সে স্বামীর হাতের উপর হাত বুলোতে লাগলো। নজর পড়লো তার স্বামীর আঙ্গুলে বিবাহের আংটির উপর।

—এটা যখন তোমায় দিয়েছিলাম তখন আমার মনে বিশেষ সুখ ছিলনা।

—আর এখন ...?

সে স্বামীর হাতের উপর চুম্বন দিয়ে বললে :

—এখন আমার খুব সুখ প্রিয়তম।

লুই তাকে চুম্বন করে শিশুকেও চুম্বন করলে। আদর পেয়ে খোকা উঠে পড়লো। লুই জানলার পর্দা সরিয়ে জানলা খুলে দিলে। সে যখন ফিরে এলো শিশু তখন স্তন পান করছে।

—খুদে লোকটীর ক্ষিদে তো কম নয় মারগেরীৎ. - হাস্‌তে হাস্‌তে বললে।

—দেখ দেখ লুই ও হাস্‌ছে, তুমি ওর বদনাম করছ, ও কিছু বুঝতেই পারছে না, তার উপর হাজার হ'ক বেটা ছেলে তো।

—তা হ'লে মেয়েদের চে' ছেলেরা বুঝি বেশী খায়। লুই হাস্‌তে হাস্‌তে জিজ্ঞেস করলে।

—তা আমি জানি না লুই। এ আমাদের প্রথম সন্তান তার উপর বেটা ছেলে সেই জন্যই আমাদের বেশী আনন্দ।

—আমারও—কিন্তু এর পরেরটী, ধর বছর খানেকের মধ্যে···তোমার মত একটি মেয়ে, কি বল ?

—এক বছরের মধ্যে !

তার গলার স্বরে যেন বেদনা ভরা। কিছুক্ষণ সে কি চিন্তা করে যেন নিজের মনে মনেই বললো।

—আর আমার স্বপ্ন।

—স্বপ্ন! পাগল হ'লে? তুমি তা'লে স্বপ্নে বিশ্বাস কর বলো?

সে ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে বল্‌লে:

—বিশ্বাস তো করতে চাইনা কিন্তু স্বপ্নটা যে ভারি অদ্ভুত!

—কিন্তু বিপদ তো কেটে গেছে; প্রসবের সময় যা ভয়। প্রসব হ'য়ে গেছে ভালোয় ভালোয় এবং বিপদের সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়ী হ'য়ে পুরস্কার লাভ করেছে! আবার ভয়ের কি আছে।

—তুমি কি বল সব বিপদ কেটে গেছে লুই? তার দুই চোখে আনন্দের আলো চকচক করে উঠলো।

—আমি নিঃশন্দেহে সে কথা বলতে পারি।

মারগেরীৎ স্বামীর হাত চেপে ধরলো। সে স্বামীকে ভক্তি ভরে বিশ্বাস করে—স্বামীর উপরে তার সম্পুর্ণ বিশ্বাস আছে।

—বাইবেল থেকে আমায় কিছু পড়ে শোনাও না লুই! লুই বইখুলে পড়তেআরম্ভ করলো যেখানটায় তার প্রথম চোখ পড়লো

"—আমি ভগবানকে ভালোবাসি—তিনি আমার মিনতি শুনবেন।"

"- তিনি আমার কথায় কান দিয়েছেন, আমি সারা জীবন তাকে ডাকবো—"

'মরণের বেদনা আমায় ঘিরেছে কবরের উদ্বিগ্নতায় আমার হৃদয় ভরা।'

'আমি মর্মন্তুদ বেদনায়, ভগবানকে স্মরণ করেছি।

"ভগবান আমার আত্মাকে মুক্ত কর—আমাদের ভগবানের হৃদয় সমবেদনায় ভরা, তিনি সুবিচারক।

"ভগবান শিশুকে রক্ষা করেন, আমার মাথা নত হ'য়েছে, তিনি আমায় বাঁচিয়েছেন।"

"আত্মা আমার, তুমি বিশ্রাম কর, ভগবান তোমায় আশীর্বাদ করেছেন।"

"তিনি আমার আত্মাকে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছেন আমার চোখের জল মুছিয়ে দিয়েছেন আমি আর বিপথে যাবো না।"

"আমি এখন ভগবানের প্রিয় হ'য়ে সেই দেশে বাস করবো যেখানে মরণ নেই।"

লুইয়ের পড়া শেষ হ'লে, মারগেরীৎ নিম্নস্বরে বললে :

—মৃত্যু যন্ত্রণা আমার চারধারে ঘিরে রয়েছে আমি ভগবানের নাম স্মরণ করেছি। ভগবান আমার আত্মাকে মুক্ত করো।

তারপর কিছুক্ষণ তার মুখের পানে চেয়ে সে শুনলে।

—শিশু যারা ভগবান তাদের ভার নেন তিনি আমাদের শিশুটির ভারও নেবেন—নয় ?

—হ্যাঁ এই কথা বলে লুই মারগেরীৎকে চুম্বন করলে।

সারা দিন সে বেশ আনন্দিত ও উৎফুল্ল হ'য়ে রইলো। ১১ তারিখ বিকেলের দিকে সে ঘুমিয়ে পড়েছিল, সে সময় ডাক্তার তাকে দেখতে এলেন। ডাক্তার চলে যাচ্ছিলেন "পরে আসবো বলে" কিন্তু সেই মুহূর্তে তার ঘুম ভেঙ্গে গেল এবং ভীত ভাবে ডাক্তারের দিকে চেয়ে রইলো।

—কি হ'লো তোমার মা ?

—ভয় !- সে ভয়ব্যাঞ্জক স্বরে বললে

তার দু'চোখের দিপ্তি অদ্ভুত।

—ভয় ! ডাক্তার হেসে উঠলেন....তা...তা...তা, কিসের ভয় মা ?

সে স্বামীর বাহুর উপর হাত রেখে বললে

-একটু ঘুমিয়ে পড়েছিলাম, নয় লুই ?

—হ্যাঁ, মার্গো—

—আবার আমি ত... ..., সে বললো। তুই চোখের চাহনি তার ভয়-ব্যাঞ্জক !

—তা তা তা—স্বপ্ন দেখে ভয় পাও তুমি। ডাক্তার বললেন। মা এত ভীরু সে কথা জানলে তোমার খোকা কি মনে করবে বলতো ?... দেখি....খেয়ে ফেল তো সবটুকু ডাক্তার তাকে এক কাপ দুধ দিলেন তার মার হাত থেকে নিয়ে।

সে খেয়ে ফেললে দুধটুকু এক চুমুকে।

—এখন ভালো বোধ করছো তো ? ডাক্তার আরও বললেন :

—মাথা থেকে ও-সব কুচিন্তা দূর করে দাও মা। তোমার এই দুর্বল অবস্থায় ও সব চিন্তা ভালো নয় যদিও এ-সময় ভয় পাওয়া একটা সাধারণ ব্যাপার। অনেক যুবতী মায়েদের দেখেছি এ রকম ভয় পেতে। এখন ঘুমোও, আমি চলি।

তিনি বেরিয়ে গেলেন, তার পিছু পিছু গেল লুই। বাইরে গিয়ে লুই ডাক্তারকে দৃষ্টি ভঙ্গিতে জিজ্ঞেস করলে : ডাক্তার ঘাড় নেড়ে বললে :

—একটু উত্তেজিত হ'য়ে পড়েছে। রাত্রে জ্বর আরও বাড়বে। ওকে ঘুমোবার ওষুধটা দিও।

—আপনার কি আর আশা নেই ডাক্তারবাবু ? কাপিত্যান অশ্রু বিজড়িত কণ্ঠে জিজ্ঞেস করলেন

—না, সে কথা তো আমি বলছি না ভালো হ'য়ে ওঠা কিছুই অসম্ভব নয়। কিন্তু যা ভয় করে ছিলাম তাই হ'লো : জ্বর হোলো

শেষ পর্যন্ত। ডাক্তার নীচে নেমে গেলেন, আবার তিনি ধীরে ধীরে উপরে উঠে দেখলেন লুই বারান্দার রেলিংএর উপর ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ডাক্তার ধীরে ধীরে লুইয়ের কাঁধের উপর হাত দিলেন। লুই চমকে উঠলো। আশ্চর্য হ'য়ে সে ফিরে চাইলো ডাক্তারের দিকে।

—ওঃ আপনি!

হ্যাঁ, আমি এসেছিলাম তোমায় বলতে, যে তোমার স্ত্রী যেন খোকাকে স্তন পান না করায়। আমি একজন ধাই পাঠিয়ে দিচ্ছি সে-ই খোকাকে দুধ খাওয়াবে, তা না করলে শিশুও পীড়িত হ'য়ে পড়বে। তারপর মারগেরীৎ যেন বুঝতে না পারে ভয়ের কোন কারণ আছে—সেটা তার পক্ষে ভীষণ খারাপ হ'বে।

তারপর লুইয়ের করমর্দন করে বললেন

—তুমি, ওরকম মনমরা হ'য়ে থেকো না—খুব বেশী ভয়ের কারণ কিছু নেই। এসব ক্ষেত্রে শতকরা ৫ জন মারা যায়। জ্বরটা বিপদ-জনক বটে কিন্তু সব রোগেতেই ভয়ের কারণ থকে,আমি চললাম।

লুই তার স্ত্রীর ঘরে প্রবেশ করলো। তার স্ত্রী মা'র সঙ্গে কথা কইছিল। তার রক্তহীন দুগাল টক টকে লাল হ'য়ে উঠেছে—এবং চোখ দুটী চক চক করছে। সে যেন উত্তেজিত হ'য়ে জোরে জোরে কথা কইছে—কিন্তু খাটো গলায়, কারণ তার পাশে শিশু ঘুমোচ্ছিল। স্বামীকে প্রবেশ করতে দেখে সে তার দিকে ফিরলো।

—মারগেরীৎ!

মারগেরীৎ তার ঠোঁটের উপর একটী আঙ্গুল রেখে লুইকে চুপ করে থাকতে বললে এবং সেই সঙ্গে দেখিয়ে দিলে তার নিদ্রিত পুত্রকে।

—বেশী কথা বলো না কষ্ট হ'বে।

সেই সময় থেরেস প্রবেশ করলো। দরজার অওয়াজ হ'তে শিশুর ঘুম ভেঙ্গে গেল।

—আঃ থেরেস, তুই ওকে জাগিয়ে দিলি—মারগেরীৎ ভৎর্সনার সুরে বললে,

তারপর শিশুকে চুম্বন করে আদর করতে লাগলো।

—আঃ……সে বললে রূপালী হাসি হেসে…কেবল ঘুম আর খাওয়া—কুড়ের সর্দার আর কিছু জানে না। সে তাকে স্তন পান করাতে গেল, সেই সময় তার স্বামী তার উত্তপ্ত হাতের উপর ধীরে ধীরে হাত রেখে বললে :

—ওকে খেতে দিও না!

মারগেরীৎ আশ্চর্য হ'য়ে স্বামীর পানে চাইলো—

—কেন?

—তোমার একটু জ্বর হ'য়েছে কি না। জ্বরের সময় ছেলেকে স্তন দেওয়া উচিত নয়—অসুখ হ'তে পারে। তোমার জ্বর ছেড়ে গেলে আবার খেতে দেবে।

ধীরভাবে সে এই কথাগুলি বললে মুখে আনন্দের ভাব ফুটিয়ে তুলে। কিন্তু বুকের কাছে তুলে লওয়া শিশুটীকে দেখে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল। তার কথা শেষ হ'তে মারগেরীৎ বললে বেদনা পূর্ণ কণ্ঠে।

—হায়রে হতভাগা শিশু।

সে শিশুর কপালে চুম্বন করলো। তার চোখ থেকে ঝরে পড়লো দুই ফোঁটা অশ্রু শিশুর আননের উপর। সে ব্যস্ত হ'য়ে তাড়াতাড়ি মুছে নিল অশ্রুজল কিন্তু তা পড়লো তার স্বামীর চোখে। সে তার যুবতী স্ত্রীর চুলের ভিতর হাত বুলোতে

লাগলো! মুহূর্ত পরে মারগেরীৎ মুখ তুলে চাইল। তার চোখে জল নেই।

—কে ওকে দুধ খাওয়াবে।

—ওঃ শাস্তো একজন ধাই পাঠিয়ে দেবেন বলেছেন। কেবল তিন চার দিনের জন্যে বইতো নয়।

সারা বিকেল নীরবে জর ভোগ করলো। তার একমাত্র চিন্তা স্বামী যেন তার কষ্ট বুঝতে না পারে যেন সে স্বামীকে আরও চিন্তিত করে না তোলে।

ধাই আসতে, মারগেরীৎ তার দিকে মনোযোগ দিয়ে দেখতে, লাগলো। সে তাকে চেনে, একজন চাষার মেয়ে মা বিকার। স্ত্রীলোকের তিনটী সন্তান। মারগেরীৎ তাকে চিনতে পেরে তার হাতের উপর হাত রেখে বললে :

—তোমার দুধ ভালো—বেশ জোরালো—নয় মা বিকার?

সে এই কথাগুলি খুব মৃদু স্বরে বললে—কিন্তু তার গলার স্বর এত কাঁপতে লাগলো সে মা বিকার-এর চোখে জল এসে গেল সম-বেদনায়।

—তুমি তো আমার বড় দুটীকে দেখেছ মা—তারা কিরকম মোটা সোটা। ছোটটীও সেই রকম এক বছর মোটে তার বয়েস, দেখলে বলবে যে দু' বছরের ছেলে। তুমি তো জানো এ কাজ আমি করি না, কিন্তু ডাক্তার বাবু যখন আমাদের বাড়ী গিয়ে বললেন, আপনার অসুখ, আর আপনার ছেলেকে দুধ খাওয়াবার জন্যে একজন ধাই-মা'র দরকার, তখন আমি এগিয়ে গিয়ে বললাম :

"আমি যাবো—আমার স্বাস্থ্য সবল—ডাক্তারবাবু। আমি খোকার ধাই মা হ'বো"। ডাক্তার বাবু খুব আনন্দিত হ'লেন আমার

কথা শুনে তিনি বললেন "তুমি হ'লে তো খুব ভালো হয় মা রিকার" আমি বল্‌লাম: "আমার গুইয়ম যখন ডুবে যাচ্ছিল মাদমোয়াজেল তাকে বাঁচিয়েছিল সে কথা কি আমি ভুলতে পারবো।

মারগেরীৎ চাষার মেয়ের হাত চেপে ধরলে। চাষার মেয়ে তখন তার কোমরে গোঁজা তোয়ালে করে চোখ মুছ্‌ছিল।

—দেখি মা তোমার খোকাকে।

অনেক উপদেশ দিয়ে মারগেরীৎ তার হাতে শিশুকে তুলে দিলে। তার উপদেশ শুনে মা রিকার মৃদু মৃদু হাসতে লাগলো। মারগেরীৎ চেয়ে রইলো স্তন পানরত শিশুর দিকে, স্বামীর হাতের ভিতরে নিজের হাত রেখে। তার স্বপ্নময় দু'আঁখি ভরে উঠলো অশ্রুজলে যখন সে দেখলে কিছুক্ষণ স্তন পান করতে করতে শিশু ঘুমিয়ে পড়লো ধাই মা'র কোলে। তার স্বামী ঝুঁকে পডলো কপালে চুম্বন করবার জন্যে। মারগেরীৎ স্বামীর হাত চেপে ধরে তার দিকে মুখ তুলে বললে নিরাশ ভাবে:

—আমি যখন আর এখানে থাকবো না, তখন আমায় ভুলে যা'বে।

রাত্রে তার ঘুম হ'লোনা—সে বললে, শিশুর দোলনা তার বিছানার কাছে খাটিয়ে দিতে। স্ত্রী ঘুমিয়ে পড়েছে ভেবে তার স্বামী একটা হেলান চেয়ারে শুয়ে পড়লো বিশ্রাম করবার জন্যে। স্ত্রীর আঁখি নিমিলিত—চোখের পাতার ছাওয়া পডেছে তার গালের উপর। তার শরীর শিশুর দিকে একটু ঝুঁকে পড়েছে। স্বামীর বুক ভেঙ্গে বেরিয়ে এলো সুদীর্ঘ দীর্ঘশ্বাস। মারগেরীৎ তার দিকে চাইলো।

—কি, তুমি ঘুমোওনি! লুই আশ্চর্য ভাবে জিজ্ঞেস করলে। এ কি করছো তুমি?

—দেখছি আমার ছেলেকে।

—কিন্তু ঘুমোলে ভালো করতে। দিনের বেলা ছেলেকে দেখবে'খন।

—কিন্তু তার আগে যদি মরে যাই। সে চুপি চুপি বললে—নিজের মনে মনে।

—তুমি কি পাগল হ'লে, কেবল মৃত্যুর কথা ভাবছো ?

—ছেলেকে নিয়ে তোমার কাছে থাকতে আমার এত ইচ্ছে, কি বলবো।

—কে তোমায় তা'তে বাধা দেবে। ভগবান তো নয়; মৃত্যুও তোমাকে আমার হাত থেকে ছিনিয়ে নিতে পারবে না।

লুই দাঁতের উপর দাঁত চেপে, কম্পমান অধরে জোরে জোরে এই কথাগুলি বললে। মারগেরীৎ হাসলো—সে হাসিতে আশা যেন নেই বললেই নয়। সে যেন একটু উত্তেজিত হ'য়ে বললে।

—প্রিয়তম !

সে চেয়ে রইলো তরে স্বামীর মুখের, পানে চোখ তার প্রেমোচ্ছল।

লুই উঠে তাকে ঘুমোবার ওষুধ খাইয়ে দিয়ে অনুরোধ করলে ঘুমোতে চেষ্টা করবার জন্যে। মারগেরীৎ ঘুমিয়ে পড়লো। ১৭ তারিখের সকাল বেলা সে অনেকটা সুস্থবোধ করতে লাগলো। কিন্তু জ্বর তখনও একেবারে ছাড়েনি—একটু কমেছে। ডাক্তার এলেন রোগীকে দেখতে। মারগেরীৎ তাকে সম্বর্ধনা করলে মিষ্টি হাসি দিয়ে এবং সে জিজ্ঞেস করলে তার শিশুকে স্তন দিতে পারে কি না। ডাক্তার হাসলেন।

—অত ব্যস্ত হ'চ্ছো কেন মা। দেখি আগে নাড়ীর কত জোর হ'য়েছে। তার পর ছেলের কথা কওয়া যা'বে।

ডাক্তার তার নাড়ী পরীক্ষা করে একটু গম্ভীর ভাবে বললেন:

—তোমার এখনও জ্বর আছে মা, এ অবস্থায় তোমার ছেলেকে স্তন দিওনা।

তার পর তার হতাশ ভাব দেখে বললেন।

—তুমি ভালো হ'য়ে উঠলে যত পার দুধ খাইও।

মারগেরীৎ হাসতে হাসতে বললে।

—তা'র কি আর সময় হ'বে ডাক্তারবাবু—তার হাসি অতি বিষাদময়। তারপর শিশুকে চুম্বন করে মারগেরীৎ বললে :

—ভগবান তোকে রক্ষে করবেন—তারপর তোর বাবাকে তো পাবি—কিন্তু মা'কে আর পাবিনা, মা আর থাকবে না।

সে মুখ ফিরিয়ে নিলে—লক্ষ্য পড়লো তার স্বামীর উপর। লুই তখন মুখ ফিরিয়ে মনের আবেগ চাপবার চেষ্টা করছে। লুই তাকে অনেক করে বারণ করলে উত্তেজিত না হতে। মারগেরীৎ শান্ত হ'য়ে বললে :

—আমি কি বোকা! এই সামান্য জ্বর তবু আমার মনে হয় যেন মরতে বসেছি।

সে তার স্বামীর কাঁধের উপর হাত রেখে বললে :

—ভয় নেই—আমার মন থেকে সব ভয় দূর হ'য়ে গেছে। এখন তুমি ভয়মুক্ত হও দেখি। আমি মরবো না, একটুও আমার মরতে ইচ্ছে নেই—বুঝলে? বলুন তো ডাক্তারবাবু সামান্য জ্বরে কখন কেউ মরে, তার উপর আমার মত যুবতী ও স্বাস্থ্যবতী মেয়ে!

—নিশ্চয় না। তোমার আনন্দ দেখে আমি ভারী সুখী হ'লাম। ঐ রকম আনন্দে থাকবার চেষ্টা করো সব সময় তা হলেই দেখবে কাল তোমার জ্বর ছেড়ে যা'বে।

ডাক্তার আবার আসবেন কথা দিয়ে চলে গেলেন। বিকেল চারটে থেকে তার জ্বর আবার বাড়তে থাকলো। বাবা তাকে দেখতে এলেন; সে তখন ভুল বকছিল। জেনেরাল তাকে সাদরে আলিঙ্গন করলেন।

মারগেরীৎ বল্‌লে:

—বাবা, ঐখানে বসো—মাথার কাছে একটা চেয়ার দেখিয়ে দিলে। তার একটী হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে মারগেরীৎ আবার বললে:

—আমি ভালো হ'য়ে যা'বো, নয় বাবা? আমরা আবার পূবে যা'বো—নীস-এ, আমি একটু ভালো হ'য়ে উঠলেই, -কি বল? তার পর স্বামীর দিকে ফিরে বললে—একটী ছোট বাড়ী নেব। নীসেতেই আমরা প্রথম আমাদের খোকার কথা কই, না? আবার আমরা নীসে যা'বো, কি বল? খোকাকে তো তার দেশ দেখান উচিত।

তার পর যেন, ভয় পেয়ে বললে:

—আমার খোকা কোথা? দাও, দাও আমার খোকাকে দাও।

বলে বিছানার উপর সে উঠে বসবার চেষ্টা করলো।

—স্থির হও। এই তো তোমার কাছেই খোকা রয়েছে, অত উত্তেজিত হয়োনা।

সে শুয়ে পড়ে শিশুকে তার পাশে নিয়ে তার মুখের পানে চেয়ে রইলো। শিশু মায়ের স্তন খুঁজতে লাগলো।

—ওর ক্ষীধে পেয়েছে এই কথা বলে সে তার জামার বোতাম খুলতে লাগলো। লুই তাকে নিরস্ত করে নিজের হাতের মধ্যে তার হাতখানি নিয়ে বল্‌লে।

—ডাক্তার যে এখন মানা করে গেছেন খোকাকে স্তন দিতে।

—কেন! সে আশ্চর্য হ'যে জিজ্ঞেস করলে। জ্বরের ঘোরে ডাক্তারের কথা সে ভুলে গেছে।

—তোমার যে অসুখ করেছে।

—অসুখ! সে ভীত ভাবে বলে উঠলো।

—হ্যাঁ।

—বেশী অসুখ নয়, নয় প্রিয়তম? ভালো হ'য়ে যাবে কি বল? শীঘ্রই ভাল হ'য়ে উঠবো কি বল? কাল? সে জিজ্ঞেস করলে বেদনা-ময় উদ্বিগ্নতা ভরে।

—হ্যাঁ।

একটি একটি করে সে কথা কইতে লাগলো। ডাক্তার শাঁস্তো ঘরে প্রবেশ করলেন।

—ডাঃ শাঁস্তো আমি মরতে চাই না, আমি ভালো হ'য়ে উঠবো। লুই সে কথা আমায় বলেছে, লুইতো কখন মিছে কথা কয় না!

এই কথা বলে সে ডাক্তারের হাত চেপে ধরলে। ডাক্তার তার হাত দেখলেন।

—এখন কেমন দেখছেন? বেশী জ্বর আমার নেই, নয়?

—একটু জ্বর আছে। কিন্তু তুমি ঘুমোবার চেষ্টা করো; তোমায় একটা ঘুমোবার ওষুধ দিচ্ছি।

—তাতে আমার ঘুম হবে?

—হ্যাঁ, মা।

—সারা রাত?

—নিশ্চয়।

—সকালে ঘুম ভেঙ্গে দেখবো ভালো হযে গেছি, নয় ডাক্তারবাবু?

—একেবারে নয়, তবে অনেকটা ভালো বোধ করবে।

ডাক্তার প্রেশ্‌কিপশন লিখলেন। ওষুধ আনা হ'লে, মারগেরীৎ ওষুধ খেলে। খাবার কিছু পরেই সে ঘুমিয়ে পড়লো। তার স্বামীর সঙ্গে মঃ শাঁস্তো তার পাশে জেগে বসে রইলেন। তার মা বাবাও ঘরের মধ্যে ছিলেন। সে ক্রমশ জোরে জোরে নিশ্বাস ফেলতে লাগলো, তার গা পুড়ে যাচ্ছে। ঘুমন্ত অবস্থায় সে বিছানার উপর ছটফট করতে লাগলো অস্থির হ'য়ে। কারুর মুখে একটি কথা নেই। মঃ শাঁস্তো একটি খবরের কাগজ পড়তে পড়তে মাঝে মাঝে রোগীর দিকে চাইছেন। মা ছেলেটিকে দোল দিচ্ছেন, পিতা তার একমাত্র মেয়ের দিকে চেয়ে আছেন—গভীর বেদনায় ভরা তার সে দৃষ্টি। কিছু পরে তার দৃষ্টি পড়লো হতভাগা স্বামীর উপর। লুই স্থির হ'য়ে থাকলেও তার মুখমণ্ডলে গভীর বেদনার চিহ্ন সুপরিস্ফুট। সে তার স্ত্রীর মাথার কাছে নতজানু হয়ে বসে আছে এবং মাঝে মাঝে পরিশ্রান্ত ভাবে মাথার বালিসের উপর মাথা রাখছে। হাতের মধ্যে রাখা স্ত্রীব হাত খানি সে চুম্বনে চুম্বনে ভরে দিচ্ছে। স্ত্রীর মুখের উপর খসে পড়া চূর্ণ কুন্তল, লুই মাঝে মাঝে সযতনে সরিয়ে দিচ্ছে। সকাল বেলা, উষার আলোয় আকাশের বুক রঙ্গীন হ'য়ে উঠছে। মারগেরীৎ তাব দুই চোখ অর্দ্ধোন্মুক্ত করলে। সে বল্‌লে :

—লুই—কই তুমি। সে বুঝতে পাবলে না য তার হাত লুইয়ের হাতের মধ্যে রয়েছে।—আমি যে তোমায় দেখতে পাচ্ছি না।

লুই তার উপর ঝুঁকে পড়লো।

—এই যে! এইবার তোমায় দেখতে পাচ্ছি, সে আনন্দ ভরে বললে—মুখে তার সুন্দর হাসি।

সে তার শীর্ণ হাত স্বামীর মুখের উপর বুলাতে বুলাতে তাকে

চুম্বন করলে। তার দুই চোখ বিস্ফারিত হ'য়ে উঠলো তার মাথা আবার ঢলে পড়লো বালিসের উপর।

—লুই আমার ছেলেটিকে দাও।

লুই ছেলেটীকে তার মুখের কাছে ধরলো। সে তার পানে অনেকক্ষণ চেয়ে থেকে তাকে চুম্বন করলে।

—ও ঘুমোচ্ছে, যাবার আগে একবার তার চক চকে চোখ দুটি দেখতে ইচ্ছে হয়···যাক, শুইয়ে দাও ওকে দোলনার উপর।

সে তার বাবার হাত নিজের হাতের মধ্যে নিয়ে বললে।

—বাবা, সব কালো হয়ে আসছে। কাছে এসো বাবা, আরও কাছে।

সে তার স্বামীর হাত চেপে ধরলো।

—আমি আর পারছি না, ভীষণ দুর্বল। আমি ঘুমোবো ; আমায় আলিঙ্গন কর প্রিয়তম—ঘুমিয়ে পড়বার আগে আমায় বুকে ধর।

লুই তাকে বুকে জড়িয়ে ধরলো।

—আমাদের ভগবান আছেন।

এই কথা বলে সে দীর্ঘশ্বাস ফেললে।

ঘুমোবার আগে সে ভগবানের কাছে চিরকালই এই প্রার্থনা করে আসছে। সে চোখ বুজলো দুই অধর অল্প উন্মুক্ত হ'লো এবং তার নির্মল আত্মা উড়ে গেল ভগবানের বুকের পানে। মারগেরীৎ চির নিদ্রায় নিদ্রিত হ'লো।

সমাপ্ত

"একটী ১৯ বছর বয়সের হিন্দু বালিকা, যে কেবল কয়েক মাস ফ্রান্সে কাটিয়েছিল, মাত্র কয়েক বছর যে ফরাসী শিক্ষা করেছিল তার পক্ষে ফরাসী ভাষায় এরূপ একখানি উপন্যাস লেখা অদ্ভুত সাহিত্য শক্তির পরিচায়ক"

James darmesteter
(Les essais de litterature anglaise)

"ইহা অতি সরল ও মর্মস্পর্শী গল্প"

Adrien Duprez

"তরু দত্ত যে পৃথিবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা বুদ্ধিশক্তি সম্পন্না মেয়েদের মধ্যে একজন তাহাতে সন্দেহ নাই। জর্জ স্যাণ্ড বা জর্জ ইলিয়ট যদি তরু দত্তের মত বয়সে মারা যেতেন ত হ'লে তাঁরা তরু দত্তের চে' বেশী কিছু রেখে যেতে পারতেন বলে মনে হয় না"।

E Gosse (Saturdav review Apr. 1879)